দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষায় কেন এত ভয় বিরোধীদের? — পৃঃ ২৩

ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের বিরোধিতা করে গণতন্ত্রের অসম্মান করছে বিরোধ জোট— পৃঃ ২৫

৭৮ বর্ষ, ৪ সংখ্যা।। ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।। ২২ ভাদ্র, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৭।। website : www.eswastika.com

নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সংঘাতে বিরোধী জোট

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ৪ সংখ্যা, ২২ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

৮ সেপ্টেম্বর - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

সম্পদ হরণকারী শাসকের চেয়ে শাসক-হন্তা কেন প্রেয়?

তৃণমুলি দুর্যোধন ☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

ক্লাসে মাস্টার মিসিং ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ জনমানসে প্রবাহিত এক শক্তিপুঞ্জ ☐ তরুণ বিজয় ☐ ৮

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সমগ্র নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সংস্কার আশু প্রয়োজন ☐ কৌটিল্য ☐ ১০

নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে অসম্মান এবং ইতিহাস বিকৃতির মতো ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছে সিপিএম ☐ ধর্মানন্দ দেব ☐ ১১

জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকা বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কর্মসূচিতে সমস্ত দেশভক্ত নাগরিকের সহায়তা করা উচিত ☐ শিশির বল ☐ ১৩

হিটলারের লেবেন্‌স্‌রাউম থেকে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ ভারতের সামনে এক ভয়াবহ সতর্কবার্তা ☐ সাধন কুমার পাল ☐ ১৫

পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাসে অনুপ্রবেশ : বাস্তবতা ও আশঙ্কা ☐ অরুণ কুমার চক্রবর্তী ☐ ১৭

আইনজীবীদের দেশবিরোধী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রভাবমুক্ত হওয়া প্রয়োজন ☐ সুদীপনারায়ণ ঘোষ ☐ ১৮

ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা ঘিরে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সোচ্চার বিরোধীরা, কেন এত ভয়? ☐ প্রণবজ্যোতি ভট্টাচার্য ☐ ২৩

ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধনের বিরোধিতার মাধ্যমে সংবিধান ও গণতন্ত্রকে অসম্মান করছে বিরোধী জোট ☐ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ☐ ২৫

বাংলা সাহিত্যের খনি বঙ্গবাণী ☐ নন্দলাল ভট্টাচার্য ☐ ৩১

ভারতবর্ষের প্রাচীন ও যোগভিত্তিক সাধনাপন্থা ☐ অপু সাহা ☐ ৩৪

ভারতে দেশবিরোধী গতিবিধিতে লাগাম টানতে শুধু আইন প্রণয়ন নয়, বরং সেটা কার্যকর হোক ☐ রঞ্জন কুমার দে ☐ ৩৫

বাংলা ভাষা এবং বাংলাদেশি ভাষা ☐ ড. চন্দ্রশেখর মণ্ডল ☐ ৩৭

এক উদ্বাস্তু বাঙ্গালির মনের ব্যথা ☐ ওম প্রকাশ ঘোষ রায় ☐ ৪৩

রাজ্যের শাসক দলের মরণ-বাঁচন লুকিয়ে 'জীবনের' কাছেই ☐ বিশ্বপ্রিয় দাস ☐ ৪৭

'মেক ইন ইন্ডিয়া, ২০২৫'-পরবর্তী মিশন ও ভিশন : 'দ্য সিলিকন ড্রিম' ☐ ড. অরিন্দম বণিক ☐ ৪৯

নিয়মিত বিভাগ :

☐চিঠিপত্র : ১৯-২০ ☐অঙ্গনা : ২১ ☐সুস্বাস্থ্য : ২২ ☐সমাবেশ সমাচার : ২৮-৩০ ☐ খেলা : ৩৮-৩৯ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ☐

ফ ঃ ১

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বাঙ্গালির দুর্গাপূজা

বাঙ্গালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা। বাঙ্গলার আকাশে বাতাসে মায়ের আগমনের সুর বেজে উঠেছে। মাকে বরণ করে নেওয়ার উচ্ছ্বাসে সেজে উঠেছে চারিদিক— শহর থেকে গ্রাম।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় বিভিন্ন বনেদি বাড়ির দুর্গাপূজার সচিত্র বিবরণ তো থাকবেই, সঙ্গে থাকবে বঙ্গের বাইরের কিছু উল্লেখযোগ্য দুর্গাপূজা নিয়ে লেখা। থাকবে বিপ্লবীদের দুর্গাপূজার বিবরণ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতার স্বার্থেই জরুরি

বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ হইল ভারত। ইহা প্রতিটি ভারতবাসীর গৌরবের বিষয়। এই গণতন্ত্রকে আরও সুদৃঢ় করিয়াছে ইহার নির্বাচনী ব্যবস্থা। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো হইবার কারণে ভারতে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। নির্বাচন প্রক্রিয়াকে এই দেশের গণতন্ত্রের সর্ববৃহৎ উৎসব বলা হইয়া থাকে। গণতন্ত্রে নির্বাচনী ব্যবস্থা অপরিহার্য। নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের ভালো-মন্দের প্রতি জনগণের মতামত ও ইচ্ছা প্রতিফলিত হয় এবং ইহার ফলে সরকার গঠিত হয়। রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনের মাধ্যমে জনকল্যাণ কার্যের নিরিখে জনগণের সমর্থন আদায় করিয়া থাকে। কাজেই নির্বাচনী প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হইবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হইলে তাহার ফলাফল সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হইয়া থাকে এবং দেশে বা রাজ্যে একটি স্থিতিশীল সরকার গড়িয়া ওঠে। স্বচ্ছ নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় জয়ী ও পরাজিত উভয় পক্ষই ফলাফলকে সম্মান করিয়া থাকে। এই নির্বাচনী প্রক্রিয়া স্বচ্ছ রাখিবার জন্য ভারতে নির্বাচন কমিশন নামে একটি সাংবিধানিক ব্যবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন আইন প্রণেতাগণ। নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানেই সময়ে সময়ে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কার্য হইয়া থাকে। এই প্রক্রিয়া ভারতে ইতিপূর্বে বহুবার সংঘটিত হইয়াছে। ইহার ফলে মৃত ভোটার, স্থানান্তরিত ভোটার, নূতন ভোটার এবং অবৈধ ভোটারের বিশেষ সমীক্ষা হইয়া থাকে। ইহাতে কোনো রাজনৈতিক দলের আপত্তি থাকিবার কথা নহে। এতদিন কেহ আপত্তিও করে নাই। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, এইবার নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিপক্ষ দলগুলি আপত্তি তুলিয়াছে। ইহার কারণ হইল, আগামী নভেম্বর মাসে বিহার রাজ্যে বিধানসভার ভোট হইবার কারণে নির্বাচন কমিশন বিহারে প্রথম ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের সমীক্ষা শুরু করিয়া বহু অসংগতি লক্ষ্য করিয়াছে। তাহার ফলে ওই রাজ্যের ভোটার তালিকা হইতে প্রায় ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়িয়াছে। তাহাতেই প্রতিপক্ষ দলগুলি নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি দোষারোপ শুরু করিয়া অপপ্রচারে নামিয়াছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনুমান, এই বিপুল সংখ্যক অবৈধ ভোটার প্রতিপক্ষ দলগুলির শক্তি। তাহা হাতছাড়া হইবার কারণেই তাহারা চিৎকার শুরু করিয়াছে।

আগামী বৎসরের মার্চ-এপ্রিল মাসে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ভোটের কারণে নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কার্য শুরু করিবার নির্দেশিকা এই বৎসরই জারি করিতে পারে। বিহার রাজ্যের পরিণতি লক্ষ্য করিয়া পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় এককোটিরও অধিক নাম বাদ পড়িবার সম্ভাবনা রাহিয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী অগ্রিম বুথ স্তরের আধিকারিক এবং জেলা শাসকদিগকে হুমকি দিয়া রাখিয়াছেন যে একজন ভোটারেরও নাম বাদ দেওয়া যাইবে না। বাদ পড়িলে তিনি নাকি পশ্চিমবঙ্গের ভোটারদের দিল্লিতে লইয়া গিয়া নির্বাচন কমিশনের দপ্তর ঘোরাও করিবেন। অথচ তিনিই যখন বিরোধী নেত্রী ছিলেন তখন অবৈধ ভোটার ও অনুপ্রবেশকারীদের নাম ভোটার তালিকা হইতে বাদ দিবার দাবিতে লোকসভার স্পিকারের টেবিলে একগুচ্ছ কাগজ ছুড়িয়া দিয়াছিলেন। ক্ষমতার স্বাদ পাইয়া তিনি তাঁহার পূর্বের দাবি হইতে সরিয়া আসিয়া নির্বাচন কমিশনের ন্যায় একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে মাতিয়াছেন। নির্বাচন কমিশন পরিষ্কার জানাইয়াছে, এই সংশোধনীতে কোনো প্রকৃত নাগরিকের নাম বাদ যাইবে না। ইতিমধ্যেই ২০০২ সালে রাজ্যে বিশেষ নিবিড় সংশোধনীপূর্বক-কৃত ভোটার তালিকাটি কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে এবং কমিশন ঘোষণা করিয়াছে, যাহাদের নাম অথবা পিতা-মাতার নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় রহিয়াছে তাহারা বৈধ ভোটার। বাকিদের কয়েকটি প্রমাণপত্রের মধ্যে যেকোনো একটি থাকিলেই তাহারা বৈধ ভোটার বলিয়া পরিগণিত হইবে। তাহা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা শাসকদলের নেতা-নেত্রীরা অপপ্রচার করিয়া চলিয়াছেন। আসলে বিহার রাজ্যে ৬৫ লক্ষ নাম বাদ পড়িতেই পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বেগ বাড়িয়াছে। সত্য কথা হইল, দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতার স্বার্থে এবং নির্বাচনী ব্যবস্থা স্বচ্ছ রাখিবার জন্যই নির্বাচন কমিশন এই প্রক্রিয়া শুরু করিয়াছে। প্রতিপক্ষ দলগুলি ইহা লইয়া রাজনীতি করিলেও প্রতিটি দেশভক্ত, ভারতীয় নাগরিক ইহাকে সাধুবাদ জানাইতেছেন।

সুভাষিতম্

যদ্যপি শুদ্ধং লোকবিরুদ্ধং।
ন করণীয়ম্ ন আচরণীয়ম্।।

শুদ্ধ হলেও যে কাজ লোকের চোখে বিপরীত, তা করা উচিত নয়, তা আচরণ করা ঠিক নয়।

সম্পদ হরণকারী শাসকের চেয়ে শাসক-হন্তা কেন প্রেয়?

তৃণমূলি দুর্যোধন

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

পুকুর মানে জলের ভাণ্ডার। সংস্কৃত শব্দ পুষ্করিণী থেকে তার সৃষ্টি। অপভ্রংশে হয়েছে পুক্কুরি বা পুক্কুর। তা থেকে পুকুর। যেখানে পদ্মফুল জন্মায়। তবে ফুলের পাশাপাশি তৃণমূলের জমানায় সে পুকুরে গোবর, কাদা আর পাঁক-দার নেতাও জন্ম নেয়। তারা মানুষের সম্পত্তি হরণ করে দুর্যোধনের মতো জলে লুকিয়ে থাকে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পাণ্ডবদের ভয়ে দ্বৈপায়ন হ্রদে লুকিয়ে ছিল দুর্যোধন।

তেমনই দল আর নিজের চুরি লুকোতে মোবাইল সমেত পুকুরে ঝাঁপ দেয় এক নিকৃষ্ট তৃণমূল নেতা। তার নাম লিখতে ঘেন্না করে। তার এতটাই নিম্নমান আর নিম্নরুচি। মহাভারতে বিকর্ণ বাদে সব কৌরব ভ্রাতার নাম 'দু' দিয়ে শুরু। এমনকী বোন দুঃশলা পর্যন্ত। নদী যেমন 'নাদ' বা শব্দ থেকে তৈরি। পুকুরের জন্য পানীয় কথাটি সেই কারণে ব্যবহৃত হয়। পুকুরকে 'নিজস্ব সম্পত্তি' হিসেবে দেখানো হয় যা কিনা মানুষের সম্পদ। যেকোনো চুরির বিশালত্ব বোঝাতে তাই 'পুকুর চুরি' কথাটি ব্যবহার করা হয়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে ক্ষমতায় আসার পর থেকে তৃণমূল পুকুর চুরিতে হাত পাকিয়েছে। বালিশ চুরিতে নয়। বালিশ চুরি মানে ছোটোখাটো চুরি। আর পুকুর চুরি হলো বৃহৎ চুরি। এর কারণ তৃণমূল নাকি কোনোদিন আশা করেনি যে, সিপিএমের মতো অত্যাচারী দলকে সরিয়ে তারা ক্ষমতায় আসবে এবং তিন দফায় ক্ষমতায় টিকে যাবে।

স্বপ্নপূরণ হওয়ার সঙ্গেই নাকি তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল স্থির করে ফেলেছিল চুরি আর তোলাবাজি করে এত সম্পত্তি বানাবে যে, ক্ষমতা থেকে সরে গেলেও তাদের চতুর্দশ প্রজন্ম দুধে-ভাতে থাকবে। আর ঘটেছেও তাই! রাজ্যের মানুষের কিয়দংশ, মুসলমান ভোটব্যাংক, অনুপ্রবেশকারী, মৃত ও ভুয়ো ভোটার এবং ভোট জালিয়াতির দৌলতে তিন বার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

২০২৬-এর ভোটের পর তৃণমূল দল যদি নতুন করে আবার লুঠপাটের সুযোগ পায়, তার জন্য রাজ্যের মানুষদের একটি অংশ আর বিরোধীরা সমানভাবে দায়ী থাকবে। রাজ্যে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকায় বিশেষ, নিবিড় সংশোধন, অবাধ নির্বাচন ও ভোটগণনা না হলে নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতাও হয়তো প্রকট হয়ে উঠতে পারে। তিনবারের ক্ষমতায় থাকা তৃণমূল যে রাজ্যের মানুষের তিনকালকে এককালে নিয়ে ফেলেছে, তা স্বচ্ছন্দে বলা যায়।

রাজ্যপাটের পৃষ্ঠাতেই এই প্রতিবেদকের পক্ষ থেকে তুলে ধরা হয়েছিল যে, কেবল তৃণমূলের ভরাডুবি এ রাজ্যকে বাঁচাতে পারে। সেরকম ধারণা ঘিরে এত সত্বর কোনো ঘটনা ঘটবে ভাবিনি। ছাগলের গাছ-পাতা খাওয়ার মতো তৃণমূল সমর্থকদের ২০২৩-এর পঞ্চায়েত ভোটে ব্যালট খেতে দেখেছে রাজ্যবাসী। 'পরশপাথর' চলচ্চিত্রের নায়কের মতো। সে পুলিশের সামনেই পরশপাথর গিলে ফেলে হজম করে ফেলে। তৃণমূলের তস্কর নেতা পুকুরে লাফ দিয়ে বাঁচতে গিয়ে ধরা পড়েছে।

এখন তৃণমূল একটি বহুস্বরা তস্করের দলে পরিণত হয়েছে। এইসব অভিযোগে তাদের নেতাদের কিছু যায় আসে না। কারণ 'তস্করপনা' তাদের রাজনৈতিক ধর্মে পরিণত হয়েছে। আড়ালে আবডালে তা মেনে নিলেও লোভ আর লাভের আশায় তাদের অনেক নেতাই দল ছাড়তে পারেন না। কিছুদিন আগে একজন প্রাক্তন আমলা অনেক হিসাব নিকাশ করে তৃণমূল থেকে সরে আসেন। সিবিআই তদন্ত এড়াতে তিনি মমতাপন্থী হয়েছিলেন। বিপদ আর নেই বুঝে সরে এসেছেন।

মিথ্যাবাদী আর চোর অভিযোগ দু'টি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রীর গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। কংগ্রেসের আঁতুড় ঘরে তৈরি বলে তা রপ্ত করতে তাকে বেগ পেতে হয়নি। কংগ্রেসি সংস্কৃতি তাকে কেবল ক্ষমতায় থাকার শিক্ষা দিয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেসের সমস্ত নির্বাচনী জয় গুরুত্বহীন। আশির দশকে বিজেপির উত্থানের আগে পর্যন্ত কংগ্রেস দেশে কোনো শক্তিশালী প্রতিপক্ষ তৈরি হতে দেয়নি। চাণক্য সম্পদ হরণকারী শাসককে হত্যার নিদান দিয়েছিলেন। চোর শাসকের মতো হৃত সম্পদকে নিজেদের সৃষ্টি বলে চালায় তৃণমূল।

কোনো তস্কর প্রধান দলের হরণ করা মাছ শাক দিয়ে ঢাকা যায় না। ছুঁড়ে দেওয়া তীর আর রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতের বাইরে চলে গেলে আর ফেরে না। ১৯৩৭-এর পর কংগ্রেসে মোহনদাস গান্ধী আর ২০১১-র পর সিপিএমে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পরিণতি দেখলে তা বোঝা যায়।

অরির শেষ রাখতে নেই। সিপিএম আর কংগ্রেসের পড়ে থাকা ১০-১২ শতাংশ ভোটের পুরো ফয়দা নিচ্ছে তৃণমূল। এই উচ্ছিষ্টকে তারা আশীর্বাদ হিসেবে ব্যবহার করছে। পিঠ বাঁচাতে 'কোনো ভোট কারুর ব্যক্তিগত বা পৈতৃক সম্পত্তি নয়' স্লোগান হলো সিপিএমের শেষ কুযুক্তি। অবশ্য তা মানলে সবার আগে তাদের দলীয় সংবিধান পুড়িয়ে ফেলা উচিত।

তৃণমূল দুর্যোধনদের দল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্থানের ভিতর দিয়ে সেখানে মুষলপর্ব আসন্ন। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার রাজ্যের ভোটদাতা এবং প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিকে করতে হবে।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

ক্লাসে মাস্টার মিসিং

ফ্যাসাদেষু দিদি,

শিক্ষার অধিকার আইনটা মনে আছে দিদি? মনে নেই? এই রে! ২০০৯ সালের আইন তো! দাঁড়ান, মনে করিয়ে দিচ্ছি।

ওই আইন অনুযায়ী স্কুলে প্রতি ৬০জন পড়ুয়ার জন্য কমপক্ষে দু'জন শিক্ষক রাখতেই হবে। মনে পড়েছে নিশ্চয়। কিন্তু দিদি, আপনার সরকারের একটা রিপোর্ট পেলাম। তাতে তো দেখলাম এই রাজ্যে দু'হাজারের বেশি প্রাথমিক স্কুলে একজনের বেশি শিক্ষক নেই। কী হবে দিদি! সামনেই তো আবার প্রাথমিকে দুর্নীতির রায় শোনাবে আদালত। তাতে ৩২ হাজারের চাকরি যেতে পারে। তখন কী হবে গো দিদি! আমার তো ভেবেই ভয় করছে। সবাই আপনাকে দোষ দেবে। কিন্তু আমি তো জানি, আপনি ভেবে-চিন্তে মিথ্যে কথা বলেন না। ওটা মুখ খুললেই বের হয়ে যায়।

এটা যে আপনার একটা অসুখ সেটা তো কেউ আর বুঝবে না। এই তো সেদিন আপনি বললেন, গত ১৪ বছরে আপনি রাজ্যে দু'কোটি চাকরি দিয়েছেন। আমি তো অবাক! কারণ, আপনি নিজেও জানেন সংখ্যাটা দু'লক্ষ হওয়াই মুশকিল। এই রাজ্যে চাকরি করার বয়স হয়েছে এমন মানুষের সংখ্যা সাত কোটির মতো। এর মধ্যে আবার দু'কোটি বয়স্ক মানুষ রয়েছেন। তাঁদের বাদ দিলে হাতে রইল পাঁচ। সেই পাঁচের মধ্যে একশো দিনের জব কার্ড রয়েছে আড়াই কোটি। পড়ে রইল আড়াই। তাদের যদি দু'কোটি চাকরি পেয়ে যায় তাবে তো রাজ্যে এমন কোনো পরিবারই নেই, যেখানে কেউ চাকরি করে না। এর পরেও রাজ্যের বাইরে পশ্চিবঙ্গের ৫০ লক্ষ মানুষ কাজ করেন। পশ্চিমবঙ্গ তো স্বর্গে চেয়েও মহান কোনো জায়গা থাকলে সেটা। কিন্তু সেটা তো নয়। অথচ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আপনি যেকথা বলেছেন, সেটা তো ফেলেও দেওয়া যায় না। কী যে করি! তাই তো আপনাকে চিঠি লিখছি।

দিদি, খুব বিপদে পড়েছি আমি। আপনিই বলে দিন কার কথা ধরব। আপনার কথা নাকি আপনার সরকারের রিপোর্ট? এই রাজ্যের প্রাথমিক স্কুলগুলি শিক্ষকের অভাবে ধুঁকছে নিয়মিত নিয়োগ না হওয়ায় বলে শুনেছি। এমন অভিযোগ উঠেছে দীর্ঘ সময় ধরেই। এবার বিকাশ ভবনেরই একটি পরিসংখ্যান থেকেও প্রাথমিক স্কুলগুলির বেহাল দশা আরও স্পষ্ট হয়েছে।

বিকাশ ভবন একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে, একজনও শিক্ষক নেই অথবা একজনমাত্র শিক্ষক রয়েছেন এমন প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা রাজ্যে ২২১৫টি। বিকাশ ভবন প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছে, এই স্কুলগুলিতে শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন একই জেলার ভেতরে শিক্ষকদের বদলি করে প্রাথমিক স্কুলের হাল ফেরাতে হবে।

এই রাজ্যে চাকরি করার বয়স হয়েছে এমন মানুষের সংখ্যা সাত কোটির মতো। এর মধ্যে আবার দু'কোটি বয়স্ক মানুষ রয়েছেন। তাঁদের বাদ দিলে হাতে রইল পাঁচ। সেই পাঁচের মধ্যে একশো দিনের জব কার্ড রয়েছে আড়াই কোটি। পড়ে রইল আড়াই। তাদের যদি দু'কোটি চাকরি পেয়ে যায় তাবে তো রাজ্যে এমন কোনো পরিবারই নেই, যেখানে কেউ চাকরি করে না।

আপনার কথা আর বাস্তব পরিস্থিতি যে কতটা আলাদা, তা ওই পরিসংখ্যান থেকেই দেখা যাচ্ছে। সব থেকে খারাপ অবস্থা পুরুলিয়ায়। সেখানে ৩০৬৭ স্কুলের মধ্যে শিক্ষক নেই বা একজন শিক্ষক আছেন এমন স্কুলের সংখ্যা ৩৭২টি। বাঁকুড়া জেলায় ৩৫৬৮টি স্কুলের মধ্যে এমন স্কুলের সংখ্যা ৩৭১টি। পশ্চিম মেদিনীপুরে ৩৪৮৭টি প্রাথমিক স্কুলের ২২৭টি স্কুলে শিক্ষকের সংখ্যা এক বা শূন্য। কলকাতার ১১৩৮টি স্কুলের মধ্যে এমন স্কুলের সংখ্যা ১৮টি। সব মিলিয়ে জেলায় ৪৯৩৬৮টি প্রাথমিক স্কুলের মধ্যে এরকম স্কুল রয়েছে ২২১৫টি।

অনেকেই মনে করছেন, প্রাথমিকে টেটের মাধ্যমে নিয়মিত নিয়োগ না হওয়ায় এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রাথমিকের টেট হয়ে ফল বেরিয়েছে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে। তারপর থেকে ইন্টারভিউ নিয়ে নিয়োগের জন্য আন্দোলন করে যাচ্ছেন টেট পাশ চাকরিপ্রার্থীরা। ২০২৩ সালে আবার টেট হয়েছে। তার ফল এখনো বের হয়নি। ২০২৪ ও ২০২৫ সালে আর টেট হয়নি।

নিয়োগ তো হয়ইনি, আবার যেটুকু শিক্ষক বদলি হয়েছে, সেখানেও অনিয়ম হয়েছে বলে অভিযোগ। কী করি বলুন তো দিদি! বড়োই আতান্তরে পড়েছি। চিঠির জবাব চাই না। আপনি খালি অবসর সময়ে যেভাবে হোক বিষয়টি রাজ্যবাসীকে জানিয়ে দেবেন। আপনার একান্ত অনুগত ভাইটি সব শোনে। ঠিক শুনে নেব। তারপরেও যদি মনে প্রশ্ন থাকে তবে কিন্তু আপনাকে আবার চিঠি লিখে বিরক্ত করব।

অতিথি কলম

তরুণ বিজয়

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ জনমানসে প্রবাহিত এক শক্তিপুঞ্জ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষব্যাপী তপস্যার ফলে বীর ভারতের নির্মাণ হয়েছে। পরবর্তী কাজ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক রূপে চলতে থাকবে।

কোনো বীরব্রতী সংগঠনকে তুলাযন্ত্রে মাপা হলে তার সঠিক মূল্যায়ন কি করা যায়? আদি শঙ্করাচার্যের পর যদি কোনো ব্যক্তি সমগ্র ভারতকে সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রীয়তার মাধ্যমে একসূত্রে গাঁথার চেষ্টা করে থাকেন তিনি হলেন ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার। ছিন্নভিন্ন, নিজেদের মধ্যে কলহ, জাতি ও ভাষা নিয়ে মতবিরোধ, ব্রিটিশের পরাধীন এবং ইসলামি জিহাদিদের আক্রমণকে নীরবে স্বীকার করা হিন্দু সমাজ অপেক্ষা করছিল কবে ছত্রপতি শিবাজী এসে তাদের রক্ষা করবে। সেই সময় ডাঃ হেডগেওয়ার জনসংগঠনকে শিবাজীর খড়্গরূপে সমাজের সামনে উপস্থান করেছিলেন।

নাগপুরে ডাঃ হেডগেওয়ারের যে বাড়িতে সঙ্ঘের স্থাপনা হয়েছিল তা সমস্ত দেশভক্তের দর্শন করা উচিত , যেমন আমরা তীর্থস্থান হিসেবে কেদার বদ্রী দর্শন করতে যাই। এটা সেই স্থান যেখানে ভারতভাগ্যবিধাতা রূপে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ স্থাপনা হয়েছিল এবং সেই মহাত্মার হাত দিয়ে যিনি 'স্ব'-এর ভাবনাকে বিরাট সমাজে বিলীন করতে গিয়ে একই দিনে নিজের পিতা-মাতাকে প্লেগ রোগের কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হতে দেখেছেন। কিন্তু এই হৃদয়বিদারক ঘটনা নীরবে সহ্য করে কখনো হিন্দু সংগঠনের কাজ সঙ্ঘকাজকে দুর্বল হতে দেননি।

পরম পূজ্য সরসঙ্ঘচালক শ্রীমোহনরাও ভাগবত এক ভিডিয়ো সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেছিলেন,"ডাক্তারজী প্রতিদিন সন্ধ্যাপর্যন্ত স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে গৃহসম্পর্ক করতে পায়ে হেঁটে বা সাইকেলে যেতেন। তারফলে এতই ক্লান্ত হয়ে পড়তেন যে সন্ধ্যার পর তাঁর চলাফেরা করা কঠিন হয়ে পড়ত। কিন্তু তাঁর ঘরের দরজা কারোর জন্য কখনও বন্ধ থাকতো না। অনেকবার এমনও হয়েছে তিনি কাজকর্ম সেরে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছেন। অত্যন্ত পরিশ্রমের জন্য হয়তো গভীর নিদ্রামগ্ন, কিন্তু সেই অবস্থায় যদি কেউ দরজায় কড়া নাড়ে, চলার ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও অতিকষ্টে বিছানা থেকে উঠে দরজা পর্যন্ত গিয়ে আগন্তুকের সঙ্গে কথা বলতেন।" এত দেরিতে এসেছো, এটা কি দেখা করার সময়? কাল এসো, এরকম কথা কখনও কাউকে বলেননি। এরকম বলা ব্যক্তিদের সঙ্ঘকাজের মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। প্রকৃত মূল্যায়ন করতে আগামী আরও একশো বছর লাগবে। আজ সঙ্ঘ জনমানসে এক প্রবাহিত শক্তিপুঞ্জ। সঙ্ঘ হলো ভারতের সমস্ত সংঘর্ষ, বেদনা, মনের ব্যথা ও রাষ্ট্রের বিজয়গাথার স্বর। হিন্দু শক্তির দ্বারা সবই সম্ভব এইরূপ আত্মবিশ্বাসের আর এক নাম হলো সঙ্ঘ। ভারতের উদ্দাম সাংগঠনিক অভীপ্সাহর নাম সঙ্ঘ। হিন্দু জনমানসে উৎপন্ন শক্তির সঞ্চিত সামূহিক স্বরূপের শিলালিপি হলো সঙ্ঘ। এটি ভারতের সেই রাষ্ট্রীয়তার অবতার, যাকে শ্রীঅরবিন্দ সনাতন ধর্মরূপে অভিহিত করেছেন।

সঙ্ঘকে কোনপ্রকার কাজের মধ্যে ফেলা যায়? সেবা, সমর্পণ থেকে সমরসতা ও শিক্ষা, রাজনীতি থেকে কৃষি ও গ্রামস্বরাজ, ধর্মজাগরণ থেকে ছাত্র আন্দোলন-সহ লোকতান্ত্রিক মূল্যবোধকে রক্ষা করা, সীমান্ত প্রহরী থেকে জনজাতি সংগঠন-সহ বিকাশ, ভাষা সাহিত্যে ভারতীয়ত্বকে সংরক্ষণ থেকে বীরভাবে ওতপ্রোত সংগীত রচনা-সহ দিশাদর্শন পর্যন্ত সমস্ত ক্ষেত্রে সঙ্ঘ বিচরণ করছে। রাষ্ট্রীয় জনজীবনে যেকোনো অংশের দিকে তাকালে দেখা যাবে সর্বক্ষেত্রে নিস্বার্থ, শান্ত ও মৌনভাবে স্বয়ংসেবকরা কর্মরত। এটাই সঙ্ঘ।

হিন্দু সমর্থ্যের শাশ্বত প্রতীক ঃ মহারাজা রণজিৎ সিংহ ইংরেজদের পরাজিত করে আফগানিস্তান পর্যন্ত পতাকা উড্ডীন করে কাশ্মীর থেকে লাদাখ পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। শিখদের ও চতুর্বেদকে রক্ষা করেছিলেন। এরকমই চোল, চের ও কৃষ্ণদেব রায় বিজয়ী যুদ্ধযাত্রার কারণে অমর হয়ে আছেন। বিশিষ্ট স্থাপত্য, কলা ও ধর্মভক্তি তাঁর পরিচয় বহন করে। শিবাজীকে সবাই কীসের জন্য চেনে? দারিদ্র্য দূর করার জন্য? দুর্গ ও অর্থব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য অথবা শত্রুকে বিনাশ করে ধর্মের রক্ষার দ্বারা হিন্দবী স্বরাজ স্থাপনার জন্য? কানপুর নিবাসী মহারাষ্ট্রের মহাকবি ভূষণ তাঁর একটি কবিতার মধ্য দিয়ে শিবাজীর রাজ্য কেমন ছিল তার বর্ণনা করেছেন। শিবাজীর দুর্গ, সড়কব্যবস্থা, বৃক্ষরোপণ, নৌসেনা সম্বন্ধে যত বই লেখা হোক না কেন ওই বর্ণনার কাছে অন্যসব ম্লান হয়ে যাবে।

মনের বিজয়ই রাষ্ট্রের বিজয় ঃ আমেরিকা সম্পন্ন দেশ শুধু ভৌতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও নিত্যনতুন বিজ্ঞান গবেষণার জন্য হয়নি। আমেরিকার জন্মদাতারা দেশবাসীকে আমেরিকান করার বিশেষ গৌরব ও স্বাভিমান সৃষ্টি করেছেন। ব্রিটিশ কুশাসন থেকে মুক্ত হওয়ার পর প্রত্যেক ক্ষেত্রে তারা আমেরিকান হয়েছেন। ব্রিটিশ পদ্ধতির সবকিছু বদল ঘটিয়েছেন। বিদ্যুতের সুইচ নীচে থেকে উপর করেছেন, গাড়ি ডান দিক থেকে চালানোর পরিবর্তে বাম দিশায় চালাতে শুরু করেছেন (Left hand drive), ভাষার মধ্যেও ব্রিটিশের

ইংরেজি বাদ দিয়ে আমেরিকান ইংরেজি চালু করেছেন। বর্তমানে সারাবিশ্ব ব্রিটিশ ইংরেজি ও আমেরিকান ইংরেজি আলাদাভাবে চিনতে পারে। অনেক বাধা অতিক্রম করে ফুট, পাউন্ড ইত্যাদি হতে আমেরিকার পরিমাপ পদ্ধতিও আলাদা করেছেন। আমেরিকার অধিবাসী হিসেবে তারা সর্বক্ষেত্রে মহান হওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে লিংকন, থমাস জেফরসন, লুথার কিং-এর মতো রাষ্ট্রনায়করা জাতির মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করেছেন, যার দ্বারা পরবর্তী কাজ স্বাভাবিক ভাবে আগে বেড়েছে।

মন শক্ত হলে শরীর সক্ষম থাকে আর মন দুর্বল হলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। সোভিয়েত ইউনিয়ন একসময় শারীরিকভাবে সবল থাকলেও মনের কারণে পিছিয়ে ছিল। অন্যদিকে পুতিনের রাশিয়া শারীরিকভাবে দুর্বল হয়েও মনোবল ও বীরত্বের কারণে বিশ্বে সুপার পাওয়ার হয়ে উঠেছে। ইজরায়েল নিজের দেশকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য ২০০০ বছর অপেক্ষা করেছে, কিন্তু মানসিকভাবে দুর্বল হয়নি। তারা প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, মারণাস্ত্র নির্মণের মতো অতুলনীয় ক্ষমতা পরে অর্জন করেছে। প্রথমে তাদের মনীষীদের মধ্যে অগ্রণী বেন গুবিয়ন ২০০০ বছর পরে অপ্রচলিত হিব্রুকে রাষ্ট্রভাষার সম্মান দিয়েছেন এবং দেশের সমস্ত কাজে হিব্রু ভাষাকে অনিবার্য করেছেন। ইহুদি বিশ্বাসকে রক্ষা করার সংকল্প করেছে। রাষ্ট্রপ্রেম ও বীরত্ব জাগ্রত করে চতুর্দিকে শত্রুদ্বারা বেষ্টিত হয়েও মজবুত মনের জন্য বিশ্বে অপরাজেয় থাকতে পেরেছে।

জ্বলন্ত দেশপ্রেম ও মূল ভূখণ্ডের প্রতি অগাধ নিষ্ঠাই হলো রাষ্ট্ররূপী দেবতার প্রাণ; ভৌতিক প্রগতি নয়। সঙ্ঘই ইসলামি আক্রমণকারী ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর মন প্রস্তুত করেছে। সঙ্ঘের যে স্বয়ংসেবককে দেশের মানুষ প্রধানমন্ত্রী রূপে নির্বাচন করেছে, সেই স্বয়ংসেবক নতুন সংসদভবন নির্মাণ করেছেন যেখানে ভারতের পরিশ্রম, অর্থ, প্রযুক্তিগত কৌশল ও নিজস্বতার ছাপ রয়েছে। যারা বলেছিল ‘অনুচ্ছেদ ৩৭০ ধারা হটালে রক্তগঙ্গা বইবে’—তাদের সামনেই ধারা ৩৭০ বিলুপ্ত হয়েছে। তিনতালাকের মতো আইন বাতিল করে মুসলমান মহিলাদের জীবনে তিনি স্বাধীনতার স্বাদ এনে দিয়েছেন এবং ভারতের হৃতগৌরব ফিরিয়ে এনে জনজাগরণ অনুষ্ঠান শুরু করে দিয়েছেন।

অষ্টম আশ্চর্য ঃ আজ যখন আমরা দেখছি হিন্দুসমাজে ধর্ম ও রাষ্ট্র মিলেমিশে চলছে তা সবার চোখে অষ্টম আশ্চর্য লাগছে। হিন্দুদের এক বড়ো অংশ বা হিন্দুনামধারী সেকুলার লোকেরা হিন্দু মন্দিরের বিরুদ্ধে যা কিছু বলতে পারে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। গজনভি থেকে পর্তুগিজ সবারই দেশ ও ধর্মবিরোধী স্বার্থভাব ছিল যাকে গত শতাব্দীতে লাল-বাল-পাল, স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, স্বামী দয়ানন্দ, বীর সাভারকর প্রমুখ কিছুটা পরিবর্তন করেছেন এবং ডাঃ হেডগেওয়ার তার মধ্যে একটা সৈনিক অনুশাসন দিয়ে অভূতপূর্ব কাজ করেছেন। তা না হলে অযোধ্যায় রামমন্দিরের স্থানে হিন্দু সেকুলারদের শৌচালয় বানাতে দেখা যেত। এটাই হলো ভারতের সুপ্ত বিজীগিষু প্রবৃত্তি। দুঃসময়কে পরাস্ত করে সামূহিক সাংগঠনিক শক্তির ঐতিহাসিক প্রকটীকরণ, যা আদি শঙ্করাচার্যের পর বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাজা চোল, কৃষ্ণদেব রায়, আরও আগে বিক্রমাদিত্য, সম্রাট অশোকের পর দেখা সম্ভব হয়নি। সেকুলার যুগে হিন্দুদের পরিচয় ছিল দুর্বল, আত্মবিস্মৃত ও আপোশকামিতা। এই মনোভাব থেকে বেরিয়ে নবীন সাহসী হিন্দুদের দেখে ভারত- শত্রুদের বেদনা জাগ্রত হয়েছে। একথা স্মরণীয় যে, রাবণ যুগের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন শ্রীরাম, কিন্তু রাবণের প্রতি কখনও অপমানজনক শব্দ ব্যবহার করেননি। তিনি রাবণের সসম্মান অন্তিম সংস্কার করিয়েছেন এবং তাঁরই ভাই বিভীষণকে লঙ্কার রাজপদে অভিষিক্ত করেছেন।

আজ সেরকম মর্যাদা পুনরুজ্জীবিত হতে দেখা যাচ্ছে। সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রাচীন গৌরবময় অতীতের প্রতি নতুনভাবে চেতনা জাগ্রত হচ্ছে। অগণিত গ্রন্থ, ভারতের জ্ঞান, মহাপুরুষদের জীবনী, প্রাচীন নগরী, নদনদী, তীর্থস্থান, পর্যটনকেন্দ্র, অরুণাচল, মণিপুর, মেঘালয়স্থিত বিভিন্ন জনসম্পদায়ের মধ্যে রামকথা পুনঃস্মরণ ইত্যাদি সম্বন্ধীয় অসংখ্য পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে। সারা বিশ্ব বর্তমানে আর্থিক ও সেনাশক্তিসম্পন্ন নতুন ভারতকে আলাদা চোখে সসম্মানে দেখতে শুরু করেছে।

পরিবর্তন আকস্মিক নয় ঃ এইসব হঠাৎ করে যাদুমন্ত্রে হয়নি। এই জাগরণ পর্ব সেইসব অনামি, অচেনা বীর, মহাপুরুষ, ধর্মগুরু যেমন ত্যাগরাজ, চৈতন্য মহাপ্রভু, রামানন্দাচার্য, আদি শঙ্কর, গুরু গোবিন্দ সিংহ, তেগবাহাদুর, বান্দা বৈরাগী প্রমুখর সঞ্চিত তপস্যা, বলিদান ও সাধনার ফল। সঙ্ঘের প্রাতঃস্মরণ ছাড়া কেউ কোনোদিন তিরুভল্লুবর বা লাচিত বরফুকনের নাম শোনেনি। উত্তরপ্রদেশের পরাক্রমী রাজা সুহেলদেবের জীবনী নিয়ে প্রবচন শোনা যায়নি। এই প্রথমবার তামিল তিরুক্কল, বরফুকনের মহান কার্য নিয়ে সারা দেশে চর্চা হচ্ছে। অহল্যাবাঈ হোলকরের নাম আজ তাওয়াং থেকে পোর্টব্লেয়ার ও লে’ পর্যন্ত সবারই মুখে মুখে। কাশীর গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং চারশো বছর বাদে রাষ্ট্রীয় স্মৃতি ও বীরত্ব জাগরণের সবচেয়ে মহান অনুষ্ঠান অযোধ্যায় শ্রীরামমন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দের কথায় ভারতের রাষ্ট্রীয়তা হলো সনাতন ধর্ম। আমরা ভবানী ভারতমাতার উপাসক, যিনি নিজে জগন্মাতার স্বরূপ। সঙ্ঘচিন্তন আধারিত প্রশাসনে সনাতন মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্য প্রশাসনিক কার্য দেখা যাচ্ছে যা কিছুদিন আগেও অসম্ভব মনে হতো। ধর্মের প্রতি অনুরাগ স্বীকার্য ছিল না। এইরূপ প্রচলিত ধারাকে অতিক্রম করা ভারতীয়ত্ব জাগরণের জন্য আবশ্যক। বর্তমান সময়ে বিশ্ব পরিদৃশ্যে প্রথমবার দেখা গেল দেশের সর্বোচ্চ নেতা ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউসের মতো আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে আয়োজিত নৈশভোজে নবরাত্রি পালনেও অংশ নিয়েছেন। যদিও এই আমেরিকাতেই গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের অন্য ছবি দেখা যেত। পদে আসীন ভারতীয় নেতার জন্য রাজকীয় ভোজে নিজ পছন্দের গোমাংস ও স্কচের ব্যবস্থা করা হতো।

সমর্থ ভারত, সক্ষম ভারত ঃ বর্তমান ভারত সমর্থ ভারত। এই ভারত সব পারে। এই বিশ্বাস সর্বসাধারণ জনমানসে অসামান্য গুণ ও শক্তি নির্মাণ করতে পারে। তাইতো আমরা দেখতে পাই চন্দ্রযানের সফল অভিযানের পর স্বপ্রেরণায় মহিলা বৈজ্ঞানিকরা পরম্পরাগত পোশাকে তিরুপতি বালাজী মন্দিরে দর্শন করতে যান। একইভাবে ব্রহ্মোস ও ভারতের অতুলনীয় রক্ষাকবচের সূত্রধার বরিষ্ঠ রক্ষা বৈজ্ঞানিক তাঁর দৈনন্দিন জীবনে ধর্মচর্চা করতে সঙ্কোচ করেননি। আজকাল বিভিন্ন মন্দির ও তীর্থস্থানে যুবক-যুবতীদের ভিড় চোখে পড়ার মতো। এসব কিছুই গভীর অভ্যন্তরীণ আলোড়নের সংকেতবাহী, সময় বদলের সংকেত, নতুন ভারত উদয়ের সম্ভাবনা। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষব্যাপী তপস্যার ফলে বীর ভারতের নির্মাণ হয়েছে। পরবর্তী কাজ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক রূপে চলতে থাকবে।

(লেখক রাজ্যসভার পূর্বতন সাংসদ)

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সমগ্র নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সংস্কার আশু প্রয়োজন

গণতন্ত্রে শাসকের পরীক্ষার পদ্ধতি হলো— 'নির্বাচন'। পরীক্ষা যেমন সঠিকভাবে না হলে ছাত্র-ছাত্রীর পড়াশোনা বা মেধার মূল্যায়ন হয় না, তেমনই নির্বাচন সঠিকভাবে না হলে শাসকের প্রকৃত মূল্যায়ন হয় না। ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিক মূল্যায়ন না হলে যেমন শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি প্রশ্নচিহ্ন উঠে যায়, তেমনই নির্বাচনী প্রক্রিয়া সঠিকভাবে পরিচালিত না হলে গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের অনাস্থা তৈরি হয়। অসৎভাবে পাশ করা কোনো ছাত্র বা ছাত্রী সমাজের প্রতি বা তার নিজের প্রতিও ন্যায়বিচার করতে ব্যর্থ হয়। তার সাম্প্রতিকতম প্রমাণ অন্যায়ভাবে নিয়োগের ফলে ২৬,০০০ শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীর চাকরি যাওয়া। সর্বোচ্চ আদালত অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ করতে বলার পর গত ৩০ আগস্ট ১৮০৬ জন অযোগ্য বা 'দাগি'র নাম প্রকাশ করে স্কুল সার্ভিস কমিশন। এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শিক্ষা দপ্তর বা এসএসসি সবাই একত্রে একটি প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতিতে যুক্ত। তাদের পরীক্ষা গ্রহণ ও নিয়োগ প্রক্রিয়ায় প্রতিটি স্তরে চরম দুর্নীতি ও জালিয়াতির কারণে সৎভাবে চাকরি পাওয়া শিক্ষক, অসৎভাবে চাকরি পাওয়া শিক্ষক এবং তাদের নিয়োগকর্তারা সবাই আজ নানা বিপদের সম্মুখীন। কিন্তু এই পরীক্ষা-পদ্ধতি যদি সঠিক ও দুর্নীতিমুক্ত হতো, তাহলে কি যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই বিপদ হতো?

উত্তর ভারতে, বিশেষ করে একদা বিমারু রাজ্যগুলিতে নির্বাচনী ব্যবস্থায় অসদুপায় অবলম্বন ছিল দীর্ঘদিনের কুপ্রথা। আর তার ফল ছিল তাদের ওই বিমারু দশা। শাসক যদি মনে করে যে, সে কাজ না করেও জিতে যেতে পারে, তবে সে কাজ করবে কেন? উত্তরপ্রদেশে মুলায়ম সিংহ যাদব বা মায়াবতী এবং বিহারে লালুপ্রসাদ যাদবের জঙ্গলরাজের পাশাপাশি পূর্ব ভারতে এর সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ জ্যোতি বসুর ২৪ বছরের ব্যর্থ শাসন। সব বিষয়ে ব্যর্থ হওয়ার পরও একের পর এক নির্বাচনে জিতে বামফ্রন্ট শুধু পশ্চিমবঙ্গ বা বাঙ্গালি জাতিকে শেষ করেনি। সঙ্গে তারা শেষ করেছে নিজেদের পার্টিগুলিকেও। তাদের ৯৫ শতাংশ সমর্থক আজ এমন তিনটি পার্টিকে ভোট দেয় যাদের তারা এবং তাদের পার্টি নেতৃত্ব দশকের পর দশক ধরে 'শ্রেণীশত্রু' হিসেবে চিহ্নিত করে এসেছে। এই বামপন্থীদের বদান্যতায় এবং ভোট জালিয়াতির সুযোগ নিয়ে ১৪ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা দখল করে রয়েছে তৃণমূল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপশাসনের পরিণামে পশ্চিমবঙ্গে না আছে শিল্প, না রয়েছে কর্মসংস্থানের সুযোগ, না ঘটেছে পরিকাঠামো উন্নয়ন। ধ্বংস হচ্ছে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা, ভেঙে পড়ছে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা। অপরাধী ও জেহাদিদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। সর্বত্র চলছে অবাধ লুঠপাট। রাজ্যের উন্নয়নের কোনো দায় এই তৃণমূল দল বা তাদের সরকারের নেই। তাই এই রাজ্যকে বাঁচাতে আজ নির্বাচন পদ্ধতিতে আমূল সংস্কার প্রয়োজন এবং আজ ঠিক সেই কাজটিই করছে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন। ইন্ডিজোটের অন্তর্ভুক্ত সেকুলার রাজনৈতিক দলগুলি এই প্রক্রিয়াকে আটকাতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে।

এই দলগুলি প্রশ্ন তুলেছে যে, ভোটার তালিকায় এই বিশেষ, নিবিড় সংশোধন সংবিধানসম্মত কিনা। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তাদের হতাশ করেছেন। দেশের সংবিধান এবং সংশ্লিষ্ট আইনকানুন মেনে যে এই কাজ বিহারে চলছে সেই ব্যাপারে তাঁরা শিলমোহর দিয়েছেন। এরপরে এই সংশোধনীর পদ্ধতি এবং সময়সীমা নিয়ে সর্বোচ্চ আদালতে প্রশ্ন তোলেন এই রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকে দাঁড়ানো আইনজীবীরা। সেই বিষয়েও যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দেয় নির্বাচন কমিশন। বিহারের ভোটার তালিকায় এই বিশেষ সংশোধনীর প্রক্রিয়ার ওপর সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশ আদায়ে ব্যর্থ হয় ইন্ডিজোট।

১৯৫০-এর পরীক্ষা পদ্ধতি, প্রশ্নপত্র তৈরির পদ্ধতি, ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি আর ২০২৫-এর পরীক্ষা পদ্ধতি নিশ্চয়ই এক নয়। আজ ছাত্র-ছাত্রীরা অনলাইনে পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড সংগ্রহ করে। পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশনও অনলাইনে হয়। অনলাইনেই হয় পরীক্ষার ফলপ্রকাশ। আগেকার দিনে মোবাইল ফোন ছিল না। বর্তমানে সবার হাতে মোবাইল ফোন থাকলেও পরীক্ষা কেন্দ্রে মোবাইল ফোন বা অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী নিয়ে আসার ব্যাপারে নতুন নিয়ম তৈরি হয়েছে। তেমনই ২০০২ সাল বা তার আগে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকায় স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশনের কাজ হতো— তার পদ্ধতি, নিয়ম আর তথ্য-প্রযুক্তির যুগে দাঁড়িয়ে আজকের নিয়মও নিশ্চয়ই এক হবে না।

দেশের অধিকাংশ রাজ্যে নির্বাচন প্রক্রিয়া মোটামুটি স্বচ্ছভাবে পরিচালিত হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭২ থেকে সম্ভবত একটা-দুটো ভোট ছাড়া কোনো দিনই সঠিক ও স্বচ্ছভাবে নির্বাচন হয়নি। আর তাই সিপিএম বা তৃণমূল— যেই রাজ্যের শাসকদল হোক, রাজ্যের উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা প্রদানের ব্যাপারে এই অগণতান্ত্রিক দলগুলি চরম উদাসীন। নকল করে পরীক্ষায় পাশ করতে পারলে কেউ কেন পড়াশোনা করবে? এই ব্যবস্থার পরিবর্তন সময়ের দাবি। আর শুধু এখানে থেমে গেলেই হবে না। ভোটের সময় বিরোধী দলের কর্মী-সমর্থকদের ভয় দেখানো, ভুয়ো ভোটারদের ভোটদান এবং ভোটগণনার সময় শাসকদল তথা আইপ্যাকের কারচুপি বন্ধ করতে হবে নির্বাচন কমিশনকে। বুথে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি বসা বন্ধ করা, নির্বাচনের কাজে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের কম অন্তর্ভুক্তি এবং ভোটগণনার প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় করে তোলার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। জাল, মাল্টিপল্ এন্ট্রি (রাজ্যের একাধিক স্থানে একই ভোটারের অস্তিত্ব), স্থানান্তরিত, ভুয়ো ভোটার এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের নাম রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার মধ্য দিয়ে বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হোক রাজ্যজুড়ে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বেশি সংস্কার প্রয়োজন পশ্চিমবঙ্গে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে অসম্মান এবং ইতিহাস বিকৃতির মতো ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছে সিপিএম

ধর্মানন্দ দেব

ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে যাঁরা সত্যিকারের বীরপুরুষ, যাঁরা নিজেদের জীবনকে তুচ্ছ করে দেশকে মুক্তির পথে এগিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক দীপ্তিমান নক্ষত্র নিঃসন্দেহে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি শুধু একজন রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন একাধারে দার্শনিক, কৌশলী সংগঠক এবং সর্বোপরি এক নির্ভীক বিপ্লবী। তাঁর চিন্তা, কর্ম ও আত্মত্যাগ একদিকে যেমন স্বাধীনতার সংগ্রামকে বিশ্বমঞ্চে পৌঁছে দিয়েছিল, অন্যদিকে ভারতীয় জাতিসত্তাকে দিয়েছে এক অদম্য আত্মবিশ্বাস। কিন্তু আজ, সেই নেতাজীকেই বিকৃত করার, তাঁর আত্মত্যাগকে কলুষিত করার অপচেষ্টা করছে একটি রাজনৈতিক দল— ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী), অর্থাৎ সিপিএম।

কেরালার একটি পাঠ্যপুস্তকে সম্প্রতি লেখা হয়েছে--- সুভাষচন্দ্র বসু নাকি ব্রিটিশদের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন জার্মানিতে। এই একটি বাক্যই যথেষ্ট প্রমাণ করার জন্য যে, ইতিহাস বিকৃতির যে বিষবীজ বপন বহু দশক আগে শুরু হয়েছিল, তা আজও বহমান। এটি নিছক কোনো ‘ভুল’ নয়, বরং এক সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক চক্রান্ত। কারণ, যে কমিউনিস্ট পার্টি স্বাধীনতার সময়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল, তারা আজও সেই একই মনোভাবকে আঁকড়ে ধরে আছে।

স্বাধীনতার লড়াইয়ের ইতিহাসে সিপিএম তথা ভারতের কমিউনিস্টদের ভূমিকা ছিল লজ্জাকর। যখন ১৯৪২ সালে মহাত্মা গান্ধী ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনের ডাক দিলেন, তখন দেশব্যাপী স্বাধীনতার দাবিতে এক জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। সেই জোয়ারে কাঁপছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। কিন্তু ভারতীয় কমিউনিস্টরা তখন দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ব্রিটিশদের পাশে। কারণ সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে

নাৎসি হিটলারের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, আর ব্রিটিশরা ছিল সোভিয়েতের মিত্র। মস্কোর নির্দেশই ভারতীয় কমিউনিস্টদের কাছে ছিল সর্বশেষ বাণী। তাই তারা জাতীয়তাবোধকে বিশ্বাসঘাতকতার তকমা দিয়ে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকে ভাঙতে তৎপর হয়েছিল। এই ভূমিকার কলঙ্ক আজও মুছে যায়নি।

অন্যদিকে, সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন— ভারতবর্ষকে মুক্ত করতে হলে শুধু অভ্যন্তরীণ আন্দোলন যথেষ্ট নয়, আন্তর্জাতিক সহায়তাও প্রয়োজন। সেই কারণে তিনি গোপনে এলগিন রোডের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। কলকাতা থেকে গোমো, তারপর কাবুল, মস্কো হয়ে বার্লিন— এক অবিশ্বাস্য যাত্রা। এই যাত্রার উদ্দেশ্য একটাই— ভারতের স্বাধীনতার জন্য আন্তর্জাতিক সমর্থন জোগাড় করা। পরে মহাবিপ্লবী রাসবিহারীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আজাদ হিন্দ ফৌজ শুধু একটি সামরিক সংগঠন ছিল না, বরং ভারতীয়দের আত্মসম্মানের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। ইতিহাসে সেই অগ্নিপথকে আজকের পাঠ্যপুস্তকে বিকৃত করে বলা হচ্ছে— তিনি

নাকি ভয়ে পালিয়েছিলেন। এটি কেবল সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি অবমাননা নয়, বরং গোটা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি চরম অসম্মান।

কোনো জাতির ইতিহাসে তার নায়কের স্থান কেবল স্মৃতিচারণায় সীমাবদ্ধ থাকে না। নায়ক মানে হলো আদর্শ প্রেরণা, আত্মত্যাগের প্রতীক। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন সেই আদর্শেরই প্রতিমূর্তি। তাঁর অগ্নিঝরা আহ্বান— 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব'— আজও প্রতিটি ভারতীয়ের রক্তকে উষ্ণ করে তোলে। তাঁর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্রযাত্রা ব্রিটিশদের মনে যে ভীতি সঞ্চার করেছিল, তা স্বাধীনতার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছিল। সেই নেতাকে ভীরু আখ্যা দেওয়া মানে গোটা জাতির আত্মমর্যাদাকে পদদলিত করা। তবে এই প্রসঙ্গে একটি গভীর সত্যও মনে রাখা জরুরি। বাঙ্গালির ইতিহাসে হিরোর অভাব কোনোদিন ছিল না। বরং বলা যায়, বাঙ্গালি জাতির মধ্যে হিরো-ওরশিপ বা নায়কপূজার প্রবণতা প্রবল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জগদীশচন্দ্র বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন, মধুসূদন দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীঅরবিন্দ, মাতঙ্গিনী হাজরা, প্রীতিলতা, ক্ষুদিরাম— এরকম অজস্র নাম ইতিহাসে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমরা কি সত্যিই তাঁদের আদর্শ, তাঁদের ত্যাগকে আমাদের জীবনে ধারণ করি? নাকি শুধু জন্মদিন-মৃত্যুদিনে মাল্যদান করে দায় সেরে ফেলি, আর বাকি সময় তাঁদের ভুলে থাকি? নেতাজীর ক্ষেত্রেও একই বাস্তবতা। আমরা তাঁকে নিয়ে আবেগপ্রবণ হই, শ্রদ্ধা জানাই, কিন্তু তাঁর কর্মধারা, তাঁর দর্শন, তাঁর আত্মত্যাগকে কতটা আত্মস্থ করতে পেরেছি?

এখানেই সিপিএমের রাজনৈতিক মতবাদকে আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। বাঙ্গালিকে হেয় করা, বাঙ্গালির আত্মসম্মানকে পদদলিত করা যেন তাদের রাজনৈতিক ডিএনএতে গাঁথা। স্বাধীনতার লড়াইয়ে যে জাতি সবচেয়ে বেশি প্রাণ দিয়েছে, সেই বাঙ্গালিদের আজও তারা হীন করে দেখাতে চায়। সিপিএমের সদর দপ্তর এ কে গোপালন ভবনে নেতাজীর ছবি নেই। এটি কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়, বরং একটি সুস্পষ্ট বার্তা। আজকের সমালোচনার চাপে হয়তো তারা সামাজিক মাধ্যমে নেতাজীর ছবি টাঙাতে পারে, কিন্তু তাদের মূল মানসিকতা বদলায়নি। শুধু এ কে গোপালন ভবন নয়, পাহাড় থেকে সাগর পর্যন্ত তাদের পার্টি অফিসগুলিতে নেতাজীর ছবি নেই। আরও প্রশ্ন— সিপিএমের কোনো পার্টি অফিসে কি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ছবি আছে? বিনয়-বাদল-দীনেশের ছবি আছে? মাতঙ্গিনী হাজরার ছবি আছে? উত্তর একটাই--- না। কারণ সিপিএম বাঙ্গালি জাত্যভিমানকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর।

নেতাজী কেবল একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন না; তিনি ছিলেন এক অসাধারণ চিন্তাবিদ ও সংগঠক। তাঁর রচনাগুলো পড়লে বোঝা যায়, তিনি একটি নতুন ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন— যেখানে মানুষ স্বাধীনভাবে মর্যাদার সঙ্গে বাঁচবে। তাঁর চেতনার মূল উৎস ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ প্রমুখ চিন্তাবিদরা। তিনি অহিংস আন্দোলনকে যেমন সম্মান করতেন, তেমনই বিশ্বাস করতেন সশস্ত্র সংগ্রামের শক্তিতেও। তাঁর চিন্তাভাবনা ছিল ভারতীয় ঐতিহ্য ও স্বাধীনতার এক অনন্য সংমিশ্রণ। স্বাধীনতার পর ভারত যদি তাঁর চিন্তাকে সঠিকভাবে আত্মস্থ করতে পারত, তাহলে দেশের রাজনৈতিক-সামাজিক বাস্তবতা আরও উন্নত হতো।

কেরলের পাঠ্যপুস্তকে নেতাজীর বিকৃতি তাই নিছক একটি 'ঐতিহাসিক ভুল' নয়। এটি সিপিএমের মূল চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ। স্বাধীনতার সময় যেমন তারা ভারতীয় জাতীয়তাবোধের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, আজও তারা একই পথে চলছে। প্রজন্মের পর প্রজন্মকে ভুল ইতিহাস পড়িয়ে নেতাজীর অবদানকে অস্বীকার করার চক্রান্ত করছে তারা। কিন্তু ইতিহাসকে বিকৃত করে কোনো জাতিকে দীর্ঘকাল বোকা বানানো যায় না। সত্য ইতিহাস শেষ পর্যন্ত আলো দেখবেই।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু শুধুই একজন নেতা নন; তিনি হলেন ভারতীয় জাতিসত্তার প্রতীক। তাঁর সংগ্রাম, ত্যাগ, আদর্শ আজও প্রতিটি ভারতীয়ের কাছে প্রেরণা। সিপিএম যতই চেষ্টা করুক, নেতাজীর নাম ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা যাবে না। কারণ নেতাজী শুধু ইতিহাস নন, তিনি হলেন ভারতাত্মার এক জীবন্ত চেতনা।

আজ আমাদের দায়িত্ব— তাঁকে কেবল জন্মদিন বা মৃত্যুদিনে স্মরণ করা নয়, তাঁর আদর্শকে আমাদের জীবনে ধারণ করতে হবে। আমাদের নতুন প্রজন্মকে তাঁর প্রকৃত ইতিহাস জানতে হবে। কারণ নেতাজীকে স্মরণ করার যোগ্যতা অর্জন করতে হলে, আমাদেরও দেশের জন্য ত্যাগ, পরিশ্রম এবং দায়িত্বশীলতার পথে হাঁটতে হবে। বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা থেকে বিরত থাকতে হবে। নতুন ভারত গঠনের লক্ষ্যে সবাইকে শামিল হতে হবে।

(লেখক পেশায় আইনজীবী)

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

** *বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকা বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কর্মসূচিতে সমস্ত নাগরিকের সহায়তা করা উচিত

শিশির বল

সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করার খবর পাওয়া যাচ্ছে। এদের বেশিরভাগের হাতে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড আছে এবং দেশের বিভিন্ন রাজ্যের নির্বাচক তালিকায় ইতিমধ্যে নাম নথিভুক্ত হয়েছে। ভারত সরকার এদের চিহ্নিত করে নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জাতীয় নির্বাচন কশিনের জ্ঞাতার্থে বিষয়টি আনার পর, বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকার এসআইআর করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন যাতে বিএলও-রা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা আপডেট ও সংশোধন করবে, অনুচ্ছেদ ৩২৬ ও অনুচ্ছেদ ৩২৪(২), দ্য রিপ্রেজেন্টশন অফ দ্য পিপল্ অ্যাক্ট, ১৯৫১-এর ২১(৩) ধারা মেনেই নির্বাচন কমিশনকে এসআইআর করবার অধিকার দিয়েছে ভারতীয় সংবিধান।

প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময় ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ হলেও বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ প্রতিবার হয় না। রাজনীতির নতুন ট্রেন্ড হলো নির্বাচনের জিতলে ক্রেডিট সেই দল ও দলের নেতৃত্বের, আর যদি হেরে যায় তাহলে যত দোষ নির্বাচন কমিশনের। মহারাষ্ট্র ও হরিয়াণা বিধানসভা নির্বাচনে ফলাফলের পর কংগ্রেসের তোপের মুখে পড়তে হয়েছিল নির্বাচন কমিশনকে। কংগ্রেস অভিযোগ করে নির্বাচনের আগে বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম ভোটার তালিকায় সংযুক্ত করার ফলে শাসক দলের বিশেষ সুবিধা হয়েছে। কংগ্রেসের দাবি ছিল ভোটার তালিকা ত্রুটিমুক্ত করতে হবে। বিভিন্ন রাজ্যে দ্রুত নগরায়ন, ঘন ঘন অভিবাসন, তরুণ নাগরিকদের ভোটার হিসেবে যোগ্য হয়ে ওঠা, মৃত্যুর খবর না দেওয়া, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের নাম অন্তর্ভুক্তির মতো একাধিক কারণে এই এসআইআর-কে প্রয়োজনীয় করে তুলেছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বলেছেন, নাগরিকরা যে এলাকার বাসিন্দা সেই এলাকায় ভোটার তালিকায় নাম নিবন্ধন করতে হবে।

ইন্ডিজোট দাবি তুলেছে প্রতি বছর যখন নির্দিষ্ট সময় ভোটার তালিকা সংশোধন হয় তাহলে ঘটা করে এসআইআর-এর কী দরকার? এখন প্রশ্ন, যদি সংশোধন সঠিকভাবে হয়ে থাকতো তাহলে ভোটার তালিকায় এত মৃত ভোটার, একাধিক জায়গায় নাম আছে এমন ভোটারদের নাম রয়ে গেল কীভাবে? ১৯৫১-র পর থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ১৩ বার এসআইআর করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। তাই বৈধ নাগরিকদের এসআইআর নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তার কারণ নেই। ২০০৩ সালের এপিক নাম্বার দিলেই হবে। ২০০৩ সালের পর যাদের নাম তালিকায় উঠেছে তাদের ফর্ম ফিলাপ করতে হবে। বিএলও বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই কাজ করবেন, তখন নতুন নাম তুলতে গেলে নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হবে। ১৯৮৭ সালের ১ জুলাই এর পর থেকে ২০০৪ -এর ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত যারা জন্মেছেন তাদের অথবা মা-বাবার কোনো একজনের বার্থ সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে।

ডিসেম্বর ২০০৪-এর পরে যাদের জন্ম তাদের মা-বাবা উভয়ের বার্থ সার্টিফিকেট বা জন্মস্থানের প্রমাণপত্র জমা দিতে হবে। বৈধ নাগরিকদের দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। নীচের ১১টি নথির একটি নথি থাকলেই তাদের নাম ভোটার তালিকায় থাকবে। (১) কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারি কর্মচারী অথবা অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী হলে সেই পরিচয় পত্র, (২) ১৯৮৭ সালের ১ জুলাইয়ের আগে ব্যাংক, পোস্ট অফিস, এলআইসির নথি, (৩) বার্থ সার্টিফিকেট, (৪) বৈধ পাসপোর্ট, (৫) স্কুল সার্টিফিকেট যেখানে বাসস্থান ও বয়সের উল্লেখ আছে, (৬) এসসি, এসটি, ওবিসি সার্টিফিকেট, (৭) এনআরসি তালিকায় নাম, (৮) বনাঞ্চল আধিকারীদের শংসাপত্র, (৯) সংশ্লিষ্ট এলাকায় বসবাসের সার্টিফিকেট, (১০) রাজ্য সরকার বা স্থানীয় প্রশাসনের তৈরি করা পারিবারিক রেজিস্টার, (১১) বাড়ির দলিল বা পর্চা যা সরকার দ্বারা প্রদত্ত— এই সব তথ্যের যে কোনো একটি। নির্বাচন কমিশন দ্বারা উল্লেখিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমা না করলে তারা ডি-ভোটার হয়ে যাবেন। যদি কোনো ব্যক্তির এই পদ্ধতির উপর আপত্তি থাকে বা এই নির্দেশের কারণে নাম বাদ গিয়ে থাকে তাহলে ইআরও-এর আদেশের বিরুদ্ধে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ও মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কাছে আবেদন জানাতে পারবেন।

গত ২৪ জুন ২০২৫ থেকে বিহারে এসআইআর-এর কাজ শুরু হয়েছে এবছর নভেম্বরে ১ মাসের বেশি সময় ধরে এই কাজ চলেছে। ২০২৫-এ বিহারের বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা ত্রুটিমুক্ত করার জন্য এই কাজ শুরু হয়েছে। বিহার থেকেই সর্বাধিক সংখ্যায় শ্রমিক অন্য রাজ্যে কাজের সূত্রে বসবাস করে। ফলে বিহারের ভোটার তালিকায় তাদের নাম আছে এবং কর্মসূত্রে বসবাসের স্থানেও নির্বাচন তালিকায় তাদের নাম নথিভুক্ত হয়েছে। এসআইআর করতে গিয়ে চমকে দেওয়ার মতো পরিসংখ্যান উঠে এসেছে— জেলা কিষাণগঞ্জ ৬৮ শতাংশ, মুসলমান বসবাসকারী আধার কার্ড ১২৬ শতাংশ, কাটিহার ৪৪ শতাংশ, মুসলমান আধার কার্ড ১৬৩ শতাংশ। অথচ বিহারের মোট নাগরিকের ৯৪ শতাংশ আধার কার্ড।

বিহারের মোট ভোটার ৭ কোটি ৯০ লক্ষের মধ্যে ৪ কোটি ৯০ লক্ষের নাম ২০০৩-এর আগেই ভোটার তালিকায় ছিল ২০০৩-এর পর ৩ কোটি নতুন নাম যুক্ত হয়েছে। এই ৩ কোটি লোককে নাগরিকত্বের প্রমাণ জমা দিতে হবে। আরজেডি-র মূল অভিযোগ হলো এত কম সময়ে এসআইআর করা সম্ভব নয়। বাস্তবে দেখা গেল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই ৯৯.৮ শতাংশ মানুষ ফর্ম ফিলাপ করতে পেরেছে। মোট ৬৫ লক্ষ ৬৪ হাজার ৭৫ জনের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গেছে। এর মধ্যে ১২ হাজার যাদের দুই জায়গায় নাম ছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে লাফালাফি শুরু করেছেন এসআইআর করতে দেবেন না বলে। কলকাতার রাজপথে মিছিল করেছেন, কংগ্রেস নেতা শুভঙ্কর সরকার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন। কিন্তু কর্ণাটকে যখন অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ধরে ডিপোর্ট করা হচ্ছে ২৪ পরগনা জেলা থেকে। কোচিতে ২৭ জন অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ধরা

পড়েছে, সিপিএম এই ব্যাপারে চুপ।

বিগত বাম আমলে ৩৪ বছরে এবং টিএমসি-র চোদ্দ বছরের শাসনকালে ২.৫ কোটি অনুপ্রবেশকারী পশ্চিমবঙ্গে ঢুকে বহু জেলার জনবিন্যাসের পরিবর্তন ঘটাতে সমর্থ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ২০০২ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ৬৬ শতাংশ ভোটার বৃদ্ধি হয়েছে শেষ ১০ বছরে মেখলিগঞ্জে ২৪.৭৭ শতাংশ, মাথাভাঙ্গায় ২১.৭৯ শতাংশ, ইসলামপুরে ৩৫.৪ শতাংশ, হরিশ্চন্দ্রপুরে ৩৭.৭১ শতাংশ, মেটিয়াবুরুজ ২৮ শতাংশ, রাজারহাট-নিউটাউনের ৪৭.৪৮ শতাংশ দমদমে ২৫ শতাংশ— গোটা পশ্চিমবঙ্গে ২১ শতাংশ গড় ৭ শতাংশ। ২০০৩ সালে মমতা ব্যানার্জি সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ অনুপ্রবেশকারীতে ভরে গেছে, ভোটার তালিকা সংশোধন করে অনুপ্রবেশকারীদের নাম বাদ দিতে হবে। এখন তিনি বলছেন, পশ্চিমবঙ্গে কোনো অনুপ্রবেশকারী নেই। তিনি ভালোভাবেই জানেন, তৃণমূল নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যাপকহারে অনুপ্রবেশকারী এই রাজ্যে প্রবেশ করেছে, ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করিয়েছে। রাজ্যে ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে জনসংখ্যা ৭ কোটি ৩০ লক্ষ, আধার কার্ড ৭ কোটি ৬০ লক্ষ। মালদায় ভোটার তালিকায় যা নাম আছে তার থেকে ১০ লক্ষ আধার কার্ড বেশি। বিশেষজ্ঞদের ধারণা পশ্চিমবঙ্গে ঠিকমতো এসআইআর হলে কমপক্ষে ১ কোটি নাম বাদ যাবে আর এখানেই, মমতার ভয়। কারণ ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে ৭০টি আসনে টিএমসি জিতেছে এক থেকে ১২ হাজার ভোটের ব্যবধানে ভোটার তালিকায় ভুয়ো ভোটার থাকলে টিএমসি-র সুবিধা। ভোটের সময় এই রাজ্যে বিরোধী দলের এজেন্টদের বহু বুথে বসতে দেওয়া হয় না।

এর জন্য রাজ্য প্রশাসন বুথের মধ্যে থাকা ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা বন্ধ করে দেয়। ভোট কর্মীদের প্রলোভন ও ভয় দেখানো হয়। ভোটার তালিকায় থাকা মৃত ও অনুপস্থিত ভোটারদের ভোটগুলি তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী টিএমসির পক্ষে পোল করিয়ে নেয়। এইভাবেই দিনের পর দিন টিএমসি ভোট ম্যানেজ করে চলেছে। টিএমসি যখন থেকে শুনেছে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর হবে এবং নাগরিকত্বের নথি হিসেবে বার্থ সার্টিফিকেট, ডেথ সার্টিফিকেট লাগবে, তখন থেকে টিএমসির নেতারা ভুয়ো বার্থসার্টিফিকেট, ডেথ সার্টিফিকেট তৈরি করিয়ে দিচ্ছে অর্থের বিনিময়ে। বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রিপোর্ট দিয়েছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পাঠানখালী গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ৩৫৮টি ভুয়ো বার্থ সার্টিফিকেট এবং ৫১০টি ভুয়ো ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে। মমতা ব্যানার্জি ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য এই অবৈধ অনুপ্রবেশকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন।

পশ্চিমবঙ্গের জনঘনত্ব স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি। সরকার কর্মসংস্থান তৈরি করতে ব্যর্থ, একের পর এক কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ২৫ লক্ষ মানুষ এই রাজ্য ছেড়ে অন্য রাজ্যে কাজ করতে যেতে বাধ্য হয়েছে। এই অনুপ্রবেশকারীরা বৈধ নাগরিকদের কর্মসংস্থান খাদ্য ও বাসস্থানের উপর ভাগ বসাচ্ছে। অনুপ্রবেশকারী মুসলমানরা বিভিন্ন জেলার জনবিন্যাস পরিবর্তন ঘটিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। এক সময়ের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলতেন সীমান্তের দুই দিকের মানুষের চেহারা এক, ভাষা এক, তাই এই অনুপ্রবেশ বন্ধ করা যাবে না। পশ্চিমবঙ্গে নাকি কোনো জঙ্গি নেই, মোল্লাবাদী চক্রান্ত নেই। সেই সময় বিএসএফ শক্ত হাতে অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে গেলে ফরওয়ার্ড ব্লক নেতারা বলতো বিএসএফ অত্যাচার করছে। ১৯৯৮ সালের ২৩ জুলাই মুম্বই থেকে অনুপ্রবেশকারীদের ধরে পশ্চিমবঙ্গে আনা হচ্ছিল পুশব্যাক করার জন্য, উলুবেড়িয়াতে ট্রেন থামিয়ে ফরোয়ার্ড ব্লক কর্মীরা অনুপ্রবেশকারীদের মুক্ত করে দেয়।

অতীতে সিপিএম যা করেছে বর্তমানে টিএমসি তাই করছে। ১৯৯৭ সালের ৬ মে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত লোকসভায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন ভারতে ১ কোটির বেশি বাংলাদেশি আছে। ২০০৪ সালে কংগ্রেসের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন ১ কোটি ২০ লক্ষ ৫৩ হাজার জন বাংলাদেশি আছে। এই অনুপ্রবেশ ঠেকাতে এবং সীমান্ত সুরক্ষা বাড়াতে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, পঞ্জাব এই তিন রাজ্যে বিএসএফ-এর কার্যক্ষেত্রে ১৫ কিলোমিটার থেকে বাড়িয়ে ৫০ কিলোমিটার করা হয়েছে। মমতা ব্যানার্জির সরকার এই সিদ্ধান্তকে মানতে নারাজ। গত মে মাসে বিএসএফ ১২২১ জন পুশ ব্যাক করিয়েছে। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের ৪৫০ কিলোমিটার বর্ডারে ফেন্সিং নেই। ফেন্সিং করার জন্য মমতা ব্যানার্জির সরকার জমি দিতে চাইছে না। ক্ষমতায় টিকে থাকা টিএমসি-র কাছে দেশের সুরক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু দেশের মানুষ চায় দেশ সুরক্ষিত থাকুক, আত্মনির্ভর হোক ভারত। এখন জিডিপি-র নিরিখে অর্থনীতিতে চতুর্থ বৃহত্তম দেশ। সামরিক দিক থেকে আমেরিকা, রাশিয়া ও চীনের পরেই ভারতের অবস্থান। প্রতিযোগিতা বাড়ছে, শত্রুরাও বসে নেই। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এই সময় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, তাই এসআইআর সময়ের দাবি। □

শোক সংবাদ

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার স্বয়ংসেবক ডায়মন্ড হারবার কোর্টের আইনজীবী তথা অধিবক্তা পরিষদের পূর্বতন সদস্য প্রবীর কুমার পুরকাইতের পিতৃদেব অহিভূষণ পুরকাইত গত ৩০ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী,২ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, সঙ্ঘের গঙ্গাসাগর জেলার প্রথম কার্যালয় তাঁর বাড়িতেই ছিল।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মহানগরের কসবা ভাগের ৪ নগর প্রচারক আশিস কুমার মণ্ডলের বাবা সুনীল কুমার মণ্ডল গত ১৭ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। তিনি ৪ পুত্র, ১ কন্য ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

সঙ্ঘের দক্ষিণ বীরভূম জেলার সিউড়ী নগরের উপকণ্ঠে লম্বোদরপুর শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক দুঃখহরণ দাস গত ৯ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ২ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

জলপাইগুড়ি নগরের স্বয়ংসেবক, পূর্বতন জেলা কার্যবাহ, পূর্ব প্রচারক সুকুমার দে'র মাতৃদেবী পুষ্পলতা দে গত ১১ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর।

* * *

গত ১৩ আগস্ট লোকান্তরিত হলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্ব প্রচারক শঙ্কর বাগ। মৃতুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ কন্যা-জামাতা ও ১ নাতিকে রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তাঁর মূল বাড়ি মেদিনীপুর জেলার সবং থানায়। ১৯৭০ সালে মেদিনীপুর কলেজে পড়া এবং মেসে থাকার সুবাদে স্বয়ংসেবক হন। ১৯৭৩ সালে স্নাতক হওয়ার পর সঙ্ঘের প্রচারক জীবন গ্রহণ করেন। প্রথম প্রচারক কামারপুকুরে। পরে বারাসাত জেলা এবং উত্তর ২৪ পরগনা বিভাগ প্রচারকের দায়িত্ব পালন করেন। প্রচারক জীবন থেকে অবসর নিয়ে হোমিওপ্যাথিতে ডিএমএস পাশ করে হালিসহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন।

হিটলারের লেবেন্স্রাউম থেকে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ
ভারতের সামনে এক ভয়াবহ সতর্কবার্তা

সাধন কুমার পাল

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু অভিযোগ করেছেন, বিলিয়নিয়ার জর্জ সোরোস বাংলাদেশের মতো ভারতকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছেন। রিজিজু এমনও বলেছেন যে, 'ভারতকে অস্থিতিশীল করার জন্য এক ট্রিলিয়ন ডলার আলাদা রাখা হয়েছে।' (সূত্র : টাইমস্ অব ইন্ডিয়া, ইকোনমিক টাইমস্) গত ২৩ আগস্ট বিকেলবেলা শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডের টি ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের হল ঘরে উত্তরবঙ্গের স্তম্ভ লেখকদের নিয়ে একটি আলোচনাসভায় একজন স্তম্ভ লেখকের বক্তব্য শুনে কিরেণ রিজিজুর সেই অভিযোগের কথা মনে পড়ে গেল। এই আলোচনাসভায় একজন স্তম্ভ লেখক অনুপ্রবেশের সমস্যা নিয়ে বলতে গিয়ে যা বললেন সেই বক্তব্যের নির্যাস হলো বাংলাদেশের আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষ উচ্চ আয়ের জন্য কিংবা নিজের জীবন নির্বাহের জন্য ঝুঁকি নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে যদি ভারতবর্ষে প্রবেশ করে তাহলে অন্যায়টা কোথায়। অনুপ্রবেশের কথা বলে এই মানুষগুলিকে নিয়ে হইচই করাটা অমানবিক। এই ধরনের স্তম্ভ লেখকদের লেখা পড়লে বা বক্তব্য শুনলে মনে হবে এরা যেন মানবিকতার মূর্ত প্রতীক। বামপন্থী লেখক বা বুদ্ধিজীবীদের প্রকৃত সত্য আড়াল করার জন্য মানবিকতার মুখোশ ধারণের পেছনে যে বিশেষ কারণ থাকে এটা বহুবার প্রমাণ হয়ে গেছে। ভাবছিলাম এই মানবিকতার মুখোশ ধারণ কি বিলিয়নিয়ার জর্জ সোরোসের অর্থের প্রভাবে?

ভারতবর্ষে মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের ভোটব্যাংক বানিয়ে ক্ষমতা দখল বামপন্থীদের, মমতা ব্যানার্জির মতো ক্ষমতা লোভীদের পুরনো রণকৌশল। অনুপ্রবেশ তত্ত্বের উপর যতই মানবিকতার প্রলেপ লাগানো হোক না কেন এর মধ্যে রয়েছে ক্ষমতার লোভী হায়নাদের এক ভয়ংকর ষড়যন্ত্র। অনুপ্রবেশকারীদের শহুরে শ্রমজীবী ও গ্রামীণ কৃষিশ্রমিক হিসেবে ভোটব্যাংক বানানোর প্রক্রিয়া বাম আমলে শুরু হয়েছিল।

বহু সীমান্তবর্তী এলাকায় এভাবেই কংগ্রেস বা পরবর্তী সময়ে বিজেপিকে প্রতিরোধ করেছে বামেরা। আর এখন বিজেপিকে প্রতিরোধ করার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসও একই অস্ত্র প্রয়োগ করছে।

পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘকালীন বাম শাসন (১৯৭৭-২০১১) চলাকালীন মানবিকতার মোড়কে অনুপ্রবেশ নিয়ে এই নরম মনোভাবের পেছনে ছিল রাজনৈতিক স্বার্থ। ভোটব্যাংকের এই বিপজ্জনক রাজনীতিকে ঢেকে রাখার জন্যই পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীরা মূলত অনুপ্রবেশকে মানবিক ও সামাজিক সমস্যা হিসেবে তুলে ধরার মরিয়া প্রয়াস নিরন্তর চালিয়ে গেছে।

সেই বাম আমলের কথা হয়তো অনেকেই ভুলে গেছেন। এখন মমতা ব্যানার্জি যেভাবে বাংলাদেশি মুসলমান ও রোহিঙ্গাদের পক্ষে গলা ফাটাচ্ছেন বাম আমলে ঠিক একই কাজ বামপন্থীরা করে গেছেন। সে সময় বিরোধী নেত্রী মমতা ব্যানার্জি অনুপ্রবেশের বিপক্ষে গলা ফাটাতেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচুর ভিডিয়ো আছে। সেগুলো দেখে যে কেউ এই সিদ্ধান্তের সত্যতা যাচাই করতে পারেন।

অধিকার ও মর্যাদার প্রশ্ন : 'জীবনের জন্য জায়গা চাই'— এই দাবি মানবিক দিক থেকে যৌক্তিক। কিন্তু যখন সেই জায়গা অর্জনের জন্য অন্যের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়, তখন তা মানবিকতার পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়।

সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে (নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, মালদা, মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি) বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ করে বসতি গড়ে তোলে। তাঁদেরকে ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড প্রভৃতির মাধ্যমে রাজনৈতিক ভোটব্যাংকে পরিণত করা হয়েছিল। এই নরম মনোভাবের ফলে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যাগত পরিবর্তন আজ রাজনৈতিক মেরুকরণের মূল কারণ হয়ে উঠেছে।

- এর ফলে স্থানীয় অর্থনীতি ও জনসংখ্যার ভারসাম্যে বড়ো পরিবর্তন এসেছে।
- অনুপ্রবেশকারীরা সস্তা শ্রমিক হিসেবে কৃষি, নির্মাণ, জুটমিল, রিকশা চালানো, গৃহকর্ম ইত্যাদিতে যুক্ত হয়েছেন। এর ফলে স্থানীয় কর্মসংস্থান ও পরিকাঠামোর ওপর বিরাট চাপ সৃষ্টি হয়েছে।

সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক হলো বামপন্থী ও তৃণমূল কংগ্রেসের ক্ষমতা দখলের এই কৌশল অনুপ্রবেশের মাধ্যমে জনবিন্যাসের পরিবর্তন ঘটিয়ে জেহাদি ইসলামিক শক্তিগুলোর ভারতকে ইসলামিক দেশে পরিণত করার ষড়যন্ত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশের মতো হিন্দুদের উপর অত্যাচার, ধর্মীয় স্থানের উপর আঘাত এগুলো নিত্যকার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, মুসলমানবহুল এলাকায় হিন্দুরা নিজের ভোটাধিকার পর্যন্ত প্রয়োগ করতে পারছে না পশ্চিমবঙ্গে এরকম এলাকা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। ইতিহাস বলছে ক্ষমতা দখলের এই কৌশল অবলম্বন করে হিটলার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাঁধিয়ে ছিলেন।

বিশ্ব ইতিহাসে 'লেবেন্স্রাউম' বা Lebensraum তত্ত্ব হিটলারের অন্যতম বিতর্কিত রাজনৈতিক দর্শন। জার্মান শব্দটির অর্থ দাঁড়ায়— 'জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় স্থান।' হিটলার বিশ্বাস করতেন, জার্মান জাতির উন্নতির জন্য তাদের আরও বিস্তৃত ভৌগোলিক অঞ্চল দরকার। তাই প্রতিবেশী দেশ দখল করে সেখানে জার্মান জনগণকে বসানো হবে, যাতে তারা খাদ্য, সম্পদ ও উন্নয়নের

সুযোগ পায়।

কিন্তু এই ধারণা কার্যকর হওয়ার পথে মানবিক সংকট ভয়াবহ রূপ নেয়। লক্ষ লক্ষ মানুষকে তাদের জন্মভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়, জাতিগত নিপীড়ন ও গণহত্যার শিকার হতে হয় এবং মানবতার ইতিহাস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো এক ভয়ংকর অধ্যায় রচিত হয়।

মানবিক বিপর্যয় : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চিত্র :

- ১৯৩৯ সালে পোল্যান্ড আক্রমণ দিয়ে যুদ্ধের সূচনা।
- ইউরোপের অধিকাংশ অঞ্চল জার্মানির দখলে যায়।
- প্রায় ৫ কোটি থেকে ৭ কোটি মানুষ নিহত হয় যুদ্ধের ফলে।
- ৬০ লক্ষ ইহুদি গণহত্যার শিকার হন হিটলারের জাতিগত নীতির অংশ হিসেবে।
- লক্ষ স্লাভিক জনগণ, প্রতিবন্ধী, জিপসি এবং রাজনৈতিক বিরোধীদেরও হত্যা বা বন্দিশিবিরে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়।

এখানেই প্রশ্ন দাঁড়ায়, একটি জাতির জীবনধারণের অধিকার অন্য জাতির বেঁচে থাকার অধিকারকে মুছে ফেলতে পারে কি?

তত্ত্ব ও অনুপ্রবেশ সমস্যা : সাদেক খানের লেখনী থেকে ভারতের বাস্তবতা

‘লেবেন্‌স্‌রাউম’ শব্দটির অর্থ ‘জীবনধারণের জন্য অতিরিক্ত ভূমি’। জার্মান নাৎসি শাসক অ্যাডল্‌ফ হিটলার এই তত্ত্বকে ব্যবহার করেছিলেন জার্মান জাতিকে ইউরোপের অন্যান্য ভূখণ্ডে বিস্তার করার যুক্তি হিসেবে। পরবর্তীকালে এই তত্ত্বকে ঘিরে পৃথিবী ইতিহাসে বহু সংঘাত, যুদ্ধ ও গণবিপর্যয় ঘটেছে। বাংলাদেশের বিশিষ্ট কলামনিস্ট সাদেক খান তাঁর লেখায় একাধিকবার উল্লেখ করেছেন যে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ও অভ্যন্তরীণ সংকটকে কেন্দ্র করে এই লেবেন্‌স্‌রাউম তত্ত্বের প্রভাব ভারতীয় ভূখণ্ডের প্রতি ছড়িয়ে পড়ছে। তাঁর মতে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহলে সরাসরি না বলা হলেও, অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে সীমান্ত পেরিয়ে আন্দোলন’ কিংবা ‘গ্রেটার বাংলাদেশ তত্ত্ব’-এর মূল ভিত।

সাদেক খানের দৃষ্টিভঙ্গি :

সাদেক খান স্পষ্টভাবে লিখেছিলেন, বাংলাদেশের কৃষিজমি ও কর্মসংস্থান সংকট সামলাতে না পেরে অতিরিক্ত জনগোষ্ঠী ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে ঠেলে দেওয়াটা রাজনৈতিকভাবে সুবিধাজনক মনে করছে বাংলাদেশি নেতৃত্ব। এভাবে একদিকে দেশের ভেতরে চাপ কমছে, অন্যদিকে সীমান্তবর্তী ভারতের জনসংখ্যাগত চিত্র বদলাচ্ছে।

ভারতের বাস্তব চিত্র :

ভারতে আজ যে অনুপ্রবেশ সমস্যা সবচেয়ে বড়ো নিরাপত্তা ও সাংস্কৃতিক সংকট হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার শিকড় এই লেবেন্‌স্‌রাউম ভাবনায়। সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোতে মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা ভয়াবহ হারে বেড়ে চলেছে। এর ফলে—

- স্থানীয় অধিবাসীদের ভূমি ও কর্মসংস্থানে চাপ পড়ছে।
- জনসংখ্যার ভারসাম্য পরিবর্তন হচ্ছে।
- সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক সংঘাত বাড়ছে।

জার্মানিতে শরণার্থী সংকট ও তার ফলাফল

জার্মানি ও ইউরোপের বহু দেশ মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সিরিয়া, ইরাক ও অন্যান্য ইসলামি দেশ থেকে আসা শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছিল। ২০১৫ সালে জার্মানির চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কেল ঘোষণা করেছিলেন— ‘Wir schaffen das’ (আমরা এটা সামলাতে পারব)। সেই সময় এক বছরের মধ্যে প্রায় ১০ লক্ষের বেশি শরণার্থী জার্মানিতে প্রবেশ করে। তবে কয়েক বছরের মধ্যে এই মানবিক উদ্যোগের নানা নেতিবাচক দিক সামনে আসতে শুরু করেছে—

১. জনসংখ্যাগত ও সাংস্কৃতিক সমস্যা :

- শরণার্থীদের বড়ো অংশ জার্মান সমাজে মিশে যেতে চাইছে না।
- ভিন্নধর্মী সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা ও সামাজিক নিয়মের কারণে দ্বন্দ্ব তৈরি হচ্ছে।
- অনেক ক্ষেত্রে তারা নিজেদের আলাদা গোষ্ঠী হিসেবে থাকতে চাইছে, যা স্থানীয়দের সঙ্গে সামাজিক দূরত্ব বাড়াচ্ছে।

২. আইনশৃঙ্খলার অবনতি :

- শরণার্থীদের একটি অংশের বিরুদ্ধে চুরি, হামলা ও স্থানীয় মহিলাদের যৌন হেনস্থার মতো অপরাধের অভিযোগ উঠেছে।
- ২০১৬ সালে বার্লিনের ক্রিসমাস মার্কেটে এক শরণার্থী সন্ত্রাসী হামলা চালায়।
- চরমপন্থী ভাবধারার প্রভাব তরুণ শরণার্থীদের মধ্যে বাড়ছে।

৩. অর্থনৈতিক চাপ :

- শরণার্থীদের আশ্রয়, ভাতা ও প্রশিক্ষণের জন্য জার্মান সরকারকে প্রতিবছর কয়েক বিলিয়ন ইউরো খরচ করতে হয়েছে।
- যদিও কিছু শরণার্থী সমস্যাকে কেন্দ্র করে জার্মানিতে ডানপন্থী রাজনৈতিক দল AFD (Alternative fur Deutschland) শক্তিশালী হয়েছে।
- সাধারণ মানুষ মনে করছে, এভাবে চলতে থাকলে জার্মানির সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা ও সংস্কৃতি হুমকির মুখে পড়বে।

যাদের মানবিক কারণে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল, তাদের একটি অংশ এখন—

- আলাদা অধিকার দাবি করছে।
- জার্মান আইনের পরিবর্তে নিজেদের দেশের শরিয়তি নিয়ম মানতে চাইছে।
- পূর্ণাঙ্গভাবে একীভূত হতে অস্বীকার করছে।

ফলে জার্মানির সার্বভৌমত্ব, সংস্কৃতির ভারসাম্য ও নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে।

এখনকার পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা নেওয়া জরুরি।

বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশ যদি অবাধে চলতে থাকে, তবে একই ধরনের সমস্যা তৈরি হবে—

● জনসংখ্যাগত ভারসাম্য বদলে যাবে। ● অতিরিক্ত অধিকারের দাবি উঠবে। ● আইনশৃঙ্খলার জটিলতা বাড়বে। ● রাজনৈতিক দলগুলো ভোটব্যাংকের জন্য তাদের ব্যবহার করবে।

তাই মানবিকতার দোহাই দেওয়া জরুরি হলেও দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব সর্বাগ্রে রক্ষা করতে হবে। □

পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাসে অনুপ্রবেশ : বাস্তবতা ও আশঙ্কা

অরুণ কুমার চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গ বহুদিন ধরেই অভিবাসন ও অনুপ্রবেশের সমস্যার মুখোমুখি। ভারত ভাগের আগে ও পরে একাধিক ঢেউয়ে শরণার্থী আসা যেমন ঐতিহাসিক সত্য, তেমনি সাম্প্রতিক দশকগুলোতে বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশও একটি বিতর্কিত ও গুরুতর সামাজিক-রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর সঙ্গে মায়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলমান অনুপ্রবেশ যুক্ত হয়ে সমস্যাকে আরও জটিল করেছে। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পরে পূর্ববঙ্গ থেকে লক্ষ লক্ষ হিন্দু উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেয়। এরা মূলত শরণার্থী ছিলেন, যাদের আগমন ছিল রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক নিপীড়নের ফল। পরবর্তী দশকগুলোতেও এই প্রবাহ চলেছে, বিশেষ করে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়। কিন্তু ১৯৭১-এর পর থেকে অভিবাসনের চরিত্র বদলাতে শুরু করে। শরণার্থীর চেয়ে বেশি আসতে থাকে অনুপ্রবেশকারী মুসলমানরা। এই অনুপ্রবেশ ধীরে ধীরে পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক ভারসাম্যে প্রভাব ফেলতে থাকে।

বিভিন্ন সমীক্ষা ও গবেষণায় দেখা গেছে যে সীমান্তবর্তী জেলাগুলো— যেমন উত্তর ২৪ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা, দুই দিনাজপুর, কোচবিহার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের জন্য প্রধান প্রবেশপথ।

সীমান্ত পরিস্থিতি : প্রায় ২,২০০ কিলোমিটার দীর্ঘ ভারত—বাংলাদেশ সীমান্ত বিশ্বের অন্যতম দীর্ঘতম স্থলসীমান্ত, যার বড়ো অংশই নদী ও জলাভূমি দিয়ে গঠিত। ফলে সীমান্ত সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত রাখা কঠিন।

অর্থনৈতিক কারণ : বাংলাদেশ থেকে আসা অনেকেই দারিদ্র্য, কর্মসংস্থানের অভাব বা ভালো জীবনের আশায় পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি : ভারতের ২০১১ সালের জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা দাঁড়ায় মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৭ শতাংশ। সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে এই হার ৫০ শতাংশেরও বেশি। বিশেষজ্ঞদের মতে এর একটি বড়ো অংশ অনুপ্রবেশকারীদের উপস্থিতির কারণে।

মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশ থেকে রোহিঙ্গা মুসলমানরা ২০১২ সাল থেকে বাংলাদেশ ও ভারতের দিকে চলে আসে। বাংলাদেশের কক্সবাজার এলাকার প্রায় ১০ লক্ষ রোহিঙ্গা শিবিরে সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও দিল্লির মতো জায়গায় তারা ছড়িয়ে পড়ছে বলে রিপোর্ট পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের বসিরহাট, বনগাঁ, বারুইপুর প্রভৃতি অঞ্চলে কিছু রোহিঙ্গা বসতি স্থাপন করেছে বলে সরকারি সূত্রে ইঙ্গিত রয়েছে।

সমস্যা হলো, এরা কাগজপত্র জোগাড় করে ভারতীয় পরিচয় গ্রহণের চেষ্টা করে এবং স্থানীয় সমাজের সঙ্গে মিশে যায়। অবৈধ অনুপ্রবেশ শুধু সংখ্যার পরিবর্তন ঘটাচ্ছে না, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহুস্তরীয় প্রভাব।

জনসংখ্যার ভারসাম্য : কিছু সীমান্তবর্তী জেলায় মুসলমানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অস্বাভাবিক রকম দ্রুত। এর ফলে হিন্দু-মুসলমানের অনুপাত পরিবর্তিত হচ্ছে।

ভোট রাজনীতি : রাজনৈতিক দলগুলো অনেক সময় এদেরকে ভোটব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করে, ফলে অনুপ্রবেশ প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয় না।

সামাজিক চাপ : সীমিত জমি, চাকরি ও সম্পদে নতুন জনসংখ্যার চাপ বাড়ছে, যার ফলে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে।

আইন-শৃঙ্খলাজনিত সমস্যা : অনুপ্রবেশকারীরা নকল কাগজপত্র, চোরাচালান, জালনোট ও এমনকী জঙ্গি কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছে বলে গোয়েন্দা রিপোর্টে উঠে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ সংস্কৃতি, ভাষা ও জীবনযাত্রা ধীরে ধীরে প্রভাবিত হচ্ছে। মাদ্রাসার সংখ্যা ও প্রভাব সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বাড়ছে, যা শিক্ষার ধরনে পরিবর্তন আনছে। যদিও সরকারি পর্যায়ে নির্দিষ্টভাবে কত বাংলাদেশি বা রোহিঙ্গা পশ্চিমবঙ্গে আছে তার সঠিক সংখ্যা জানানো হয়নি, তবে বিভিন্ন সমীক্ষা ও রাজনৈতিক দলগুলির অনুমান ৫০ লক্ষ থেকে ১ কোটি অনুপ্রবেশকারী থাকতে পারে। জাতিসঙ্ঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থার হিসাব অনুযায়ী প্রায় চল্লিশ হাজার রোহিঙ্গা ভারতে অবস্থান করছে, তার একটি বড়ো অংশ পশ্চিমবঙ্গে।

জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ : অনুপ্রবেশকারীরা জেহাদি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বলে জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলি আশঙ্কা প্রকাশ করেছে।

কাগজপত্র জালিয়াতি : ভোটার কার্ড, আধার, রেশন কার্ড সহজলভ্য হওয়ায় বেআইনিভাবে এরা দ্রুত ভারতীয় নাগরিক পরিচয় লাভ করছে।

প্রশাসনিক ব্যর্থতা : দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে রাজনৈতিক টানাপোড়েন থাকায় সমস্যার সমাধান হয়নি। এনআরসি-র মতো পদক্ষেপ পশ্চিমবঙ্গে গৃহীত হয়নি।

সাধারণ মানুষের উদ্বেগ : পশ্চিমবঙ্গের বহু সাধারণ মানুষ মনে করেন যে, অবৈধ অনুপ্রবেশের ফলে কর্মসংস্থানে প্রতিযোগিতা বাড়ছে, স্থানীয়দের জমি ও সম্পদে চাপ পড়ছে, নিরাপত্তা ও সামাজিক সাদৃশ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, ধীরে ধীরে পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস, সাংস্কৃতিক চরিত্র ও রাজনৈতিক পরিবেশ বদলে যাচ্ছে। অনুপ্রবেশ পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাসে এবং পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ভারসাম্যে গভীর প্রভাব ফেলছে। যদি একে নিয়ন্ত্রণে না আনা যায়, তবে ভবিষ্যতে জনসংখ্যার অনুপাত, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক দিকনির্দেশ মৌলিকভাবে পালটে যেতে পারে।

তাই জরুরি হলো, সীমান্ত রক্ষায় কঠোর পদক্ষেপ, নথিভুক্ত নাগরিকদের সঠিকভাবে আলাদা করা, মানবিক দিক বজায় রেখে বাস্তবসম্মত অভিবাসন নীতি তৈরি করা। শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থে সংখ্যা আড়াল করলে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ চরম সংকটে পড়তে পারে।

আইনজীবীদের দেশবিরোধী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রভাবমুক্ত হওয়া প্রয়োজন

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমি মন্দিরের বিরোধিতায় সুপ্রিম কোর্টে লড়েছিল ৩৫ জন হিন্দু আইনজীবী। এনাদের ফি সব মিলিয়ে কত কোটি টাকা তার হিসাব হয়তো জানা নেই। অন্তত এই প্রতিবেদকের জানা নেই। কারা তাদের এই বিপুল অঙ্কের অর্থের যোগান দেন? গোটা দেশ হয়তো এই বিষয়টা উপেক্ষা করে এসেছে। দেশের শীর্ষ আদালতে বা রাজ্যগুলির উচ্চ আদালতগুলিতে এইসব ব্যাপার হয়তো আকছার ঘটে থাকে। এটা যদিও একটি বড়ো মাপের দুর্নীতি বা কেলেঙ্কারি, যা একটি গভীর ষড়যন্ত্রের ফলাফল। শীর্ষ আদালত বিষয়টির প্রতি দৃক্‌পাত না করলেও নিম্ন আদালতের একজন বিচারপতি এই ষড়যন্ত্র এবং অনৈতিক আঁতাতের মুখোশ খোলার সাহস দেখিয়েছেন।

এ বছর ৩ জানুয়ারি এনআইএ কোর্ট বা জাতীয় তদন্ত সংস্থার আদালতের বিশেষ বিচারক বিবেকানন্দ শরণ ত্রিপাঠী একটি মামলায় রায় ঘোষণা করেন। ২০১৮ সালের ২৬ জানুয়ারি কাসগঞ্জের অভিষেক ওরফে চন্দন গুপ্তকে নৃশংসভাবে খুনের অপরাধে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ২৮ জন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এই রায়ে তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। চন্দন গুপ্ত যখন তিরঙ্গা যাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন, তখন অভিযুক্তরা এই পাশবিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে। ভিএস ত্রিপাঠী শুধু তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডই দেননি, রায়দান করার সময় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলেছেন তিনি। শুধুমাত্র অর্থের লোভে যেকোনো অপরাধীর হয়ে এইসব নামিদামি আইনজীবীর মামলা লড়ার মানসিকতা বিষয়টি তাঁর পর্যবেক্ষণে উঠে আসে। যদিও সুপ্রিম কোর্ট বা কোনো রাজ্যের হাইকোর্টের কোনো বিচারপতি কখনও এই বিষয়ের ওপর কোনো মন্তব্য করেননি। এই রায় ঘোষণা করতে গিয়ে বিচারক ভিএস ত্রিপাঠী অপরাধীদের আড়াল করার জন্য জড়িত দেশি ও বিদেশি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর রায়ের প্রতিলিপিও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং বার কাউন্সিলে পাঠিয়ে দেন বিচারক ভিএস ত্রিপাঠী। এই আইনজীবীদের সতর্ক করে তাদের নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং আইনজীবীদের রেজিস্ট্রেশন প্রদানকারী সংস্থাকে তিনি বলেন। তাঁর দেওয়া রায়ে বিচারক ত্রিপাঠী বলেছেন— 'কারা, কোথায় এইসব সংস্থাকে অর্থ দিচ্ছে এবং তাদের আসল মতলব বা উদ্দেশ্য যে কী— সেই বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। এই অভিযোগ উঠে এসেছে যে, যখনই কোনো সন্ত্রাসবাদী গ্রেপ্তার হয়, তাদের রক্ষা করার জন্য অতি সত্বর দামি দামি আইনজীবীদের দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। এটা জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে ঘোরতর উদ্বেগের কারণ।' আদালতের দেওয়া রায়ে সাতটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নাম উল্লেখিত হয়েছে। সংগঠনগুলি হলো— (১) সিটিজেন্স ফর পিস অ্যান্ড জাস্টিস, দিল্লি (২) পিপল'স্ ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ (৩) রিহাই মঞ্চ (৪) অ্যালায়েন্স ফর জাস্টিস অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি (৫) ইন্ডিয়ান আমেরিকান মুসলিম কাউন্সিল, ওয়াশিংটন ডিসি (৬) সাউথ এশিয়া সলিডারিটি গ্রুপ (৭) জমিয়ত উলেমায়ে হিন্দ।

বিচারক ভিএস ত্রিপাঠীর রায় সত্যিই অভূতপূর্ব। এছাড়াও সরকারের বিবেচনার জন্য তিনি কয়েকটি প্রস্তাবও রেখেছেন। প্রস্তাবগুলি হলো— সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টে অনুশীলনরত আইনজীবীদের ফি জনসমক্ষে আনা হোক এবং জনগণের অবগতির জন্য তাঁদের সম্পত্তির বিবরণ প্রকাশিত হোক। প্রতি বছর কত টাকা আয়কর দিয়েছেন, সেই হিসাব তাঁরা ঘোষণা করুন। আইনজীবীদের ফি কেবলমাত্র চেক অথবা ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে প্রদান করা উচিত। সুপ্রিম কোর্টের শীর্ষ আইনজীবীদের থেকে এফিডেভিট নিতে হবে। তাতে থাকবে তাঁদের মামলার ফি-র রসিদ সংক্রান্ত তথ্য। কে তাঁদের ফি দিয়েছে, কত টাকা ফি দিয়েছে ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ-সংবলিত এফিডেভিট এই আইনজীবীদের জমা করতে হবে, যাতে এটা পরিষ্কার হয় তাঁরা কোনো সন্ত্রাসবাদী সংগঠন দ্বারা অর্থপ্রাপ্ত হয়েছেন কিনা।

বিচারক ভিএস ত্রিপাঠীর দেওয়া এই ঐতিহাসিক রায়কে সকলের স্বাগত জানানো উচিত এবং সব দেশপ্রেমিক ভারতীয়র এই বিষয়টিকে সমর্থন করা উচিত। ভারতে অনুপ্রবেশকারী, জঙ্গি, জেহাদিদের জন্য নামিদামি আইনজীবীদের দাঁড়িয়ে যাওয়াটা যদিও নতুন কোনো বিষয় নয়। এদিকে রোহিঙ্গা-বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বহিষ্কারের জন্য বিশিষ্ট আইনজীবী অশ্বিনী উপাধ্যায়ের করা আবেদন ২০১৭ সাল থেকে ঝুলে রয়েছে। মহম্মদ সালিমুল্লা ও মহম্মদ সাকির— এই দু'জন রোহিঙ্গার জন্য ৬ জন বড়ো মাপের আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করতে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন এমন উদাহরণও রয়েছে। তাদের চেহারা, বেশভূষা দেখে মনে হবে তারা ভিখারি এবং চরম দুরবস্থার মধ্যে জীবন কাটিয়ে থাকে। এই আইনজীবীরা হলেন রাজীব ধাওয়ান, প্রশান্ত ভূষণ, অশ্বিনী কুমার, কলিন গঞ্জালভেজ, মায়াত ফলি নরিম্যান এবং সেই পরিচিত মুখ— কপিল সিব্বল।

'জোরপূর্বক ধর্মান্তরণ' নিবারণের জন্য আইনজীবী অশ্বিনী উপাধ্যায়ের করা মামলার বিরোধিতা করতে নেমে পড়েছে ১০ জন নামি আইনজীবী। উপাসনালয় স্থান আইনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তাঁর করা আবেদনের বিরোধিতা করছেন ২২ জন শীর্ষ আইনজীবী। এই আইনজীবীদের মধ্যে রয়েছেন সাংসদ, বিধায়ক, প্রাক্তন আইনমন্ত্রী, প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী এবং প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীরা। এই শীর্ষস্থানীয় আইনজীবীদের কারণে এই আবেদনের শুনানি দীর্ঘদিন ধরে আটকে রয়েছে। ২০২৪ সালের অক্টোবরে 'সোশ্যাল জুরিস্ট'- নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দিল্লি হাইকোর্টে আবেদন করেছে রোহিঙ্গা শিশুদের সরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ দেওয়ার জন্য সরকারকে নির্দেশ দিতে। রোহিঙ্গারা বিদেশি এবং এদেশে ঢোকার ক্ষেত্রে তাদের কোনো বৈধ অনুমতি নেই এবং তারা দেশের পক্ষে বিপজ্জনক— এই বিষয়গুলি তুলে ধরে হাইকোর্ট যখন সেই আবেদন খারিজ করে দেয়, তখন এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটি সুপ্রিম কোর্টে চলে যায় এবং আবেদন জানায় যে, রোহিঙ্গা শিশুদের শিক্ষাদান করতে হবে। এইরকম বহু আইনজীবী ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এদেশে রয়েছে যাদের সকলের অর্থপ্রাপ্তির উৎস তদন্ত করে দেখা উচিত। বিচারক ভিএস ত্রিপাঠীর দেওয়া রায়ের বিষয়টি দেশের সর্বত্র আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। বিচারবিভাগের সঙ্গে যুক্ত প্রভাবশালী আইনজীবী মহলের স্বেচ্ছাচার ও অসংবেদনশীলতা দূর করার জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস দরকার। □

বিল পেশ করতে গেলে সংসদে তুমুল বিরোধিতা, জেপিসিতে নেই কেন তৃণমূল?

নরেন্দ্র মোদী সরকার দুর্নীতি মুক্ত প্রশাসনের লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধন একটি বিল পেশ করতে গেলেই তৃণমূল সমেত ইন্ডি জোট সংসদে তুমুল বিক্ষোভ দেখায়। মমতা ব্যানার্জি বিল পেশের দিনটিকে 'কালো দিন' আখ্যা দিয়ে বিলটিকে 'কালো বিল' আখ্যা দেন। তিনি রাহুল গান্ধীর থেকে বড়ো বিরোধী ও নিজেকে বড়ো নেত্রী প্রমাণে সর্বদা ব্যস্ত। তিনি বিরোধী দলের প্রধানমন্ত্রী মুখ হতে ভীষণ লালায়িত।

দেশের মানুষ দুর্নীতির বিরুদ্ধে এমন কঠোর একটা বিল চেয়েছে। মমতা ব্যানার্জির প্রাণ নাকি সাধারণ মানুষের দুঃখে ভীষণ কাঁদে। তাই যে বিল দুর্নীতির বিরুদ্ধে, যে বিলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে দেশের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও কঠোর। তাতে মমতা ব্যানার্জির আপত্তি থাকার কথা নয়। অবশ্যই এই বিলের আওতায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাও আসবে। দুর্নীতির প্রশ্নে এদের কেউ গ্রেপ্তার হয়ে যদি ৩০ দিনের মধ্যে জামিন না পায় তাহলে তাকে পদ ছেড়ে দিতে হবে। যদি কেউ না ছাড়ে তাহলে তাকে বরখাস্ত করা হবে। তাই কি তৃণমূলের আপত্তি? এই বিল পাশ হলে, জেলে থেকে অর্থাৎ জেলে বসে সরকারি ফাইলে সই করার ফ্যাশন আর চলবে না। মন্ত্রী বলে আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শনের দিন শেষ। বিলে আপত্তি থাকলে তা জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির সামনে পেশ করার নিয়ম। শুনতে পাচ্ছি তৃণমূল সেখানে যাবে না।

তৃণমূলের এই আচরণ বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নের মতো। আমি একটা রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের অবসর প্রাপ্ত কর্মচারী। আমরা দেখেছি ওখানে বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন জেনারেল ম্যানেজারের চেম্বারে হাত জোড় করে মিন মিন করে কথা বলে বাইরে বেরিয়ে এসে গরম গরম ভাষণ দিত। ওদের এই ভণ্ডামির জন্য অবসর প্রাপ্ত ব্যাংক কর্মচারীদের পেনশন আপডেটেড হচ্ছে না। ভুগছেন অবসর প্রাপ্ত কর্মচারীরা। মমতা ব্যানার্জি ও তার দলের আচরণের জন্য দেশের সাধারণ মানুষকে যেন মূল্য না চোকাতে হয়।

—শ্যামল কুমার হাতি,
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

সিনেমা 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস'

গত ১৫ আগস্ট কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে বিবেক অগ্নিহোত্রীর ছবি 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' ট্রেলার প্রকাশে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী, কারও কারও দাবি বেঙ্গল ফাইলস না করে গুজরাট ফাইলস করছেন না কেন পরিচালক?

উত্তরে জানাই কয়েক বছর আগেই গুজরাট দাঙ্গা নিয়ে চারটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরি হয়েছে। নির্মাতারা হলেন পঙ্কজ, শঙ্কর, গোপাল মেনন, ললিত ভাচিন এবং সৌমিত্র দস্তিদার। এই ফিল্মগুলি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এই ফিল্মগুলি কলকাতা শহরে হল ভাড়া করে মুসলমান মোল্লা-মৌলভিদের দেখানো হয়েছিল প্রথমেই দেখানো হয়েছে--- গোধরা স্টেশনে একটি ট্রেন দাঁড়ানো। যাত্রীরা সব আস্তে আস্তে নেমে গেল। তারপর আবছা অন্ধকারে স্টেশনের একটু দূরে ৩/৪টি পোড়া কামরা পড়ে আছে। ১-২ সেকেন্ড মাত্র ওই পোড়া কামরাগুলি প্রদর্শিত হলো। তারপর ভেসে এলো একের পর এক পুড়ে কাঠ কয়লা হয়ে যাওয়া দেহের অংশ, সারি সারি মরা মানুষ (মুসলমান এরিয়া) আর কণ্ঠস্বরে ভেসে আসছিল— আমার বোনের পেটে আট মাসের বাচ্চা আছে ওকে ছেড়ে দাও, তলোয়ার দিয়ে তার পেট চিরে আট মাসের বাচ্চাটাকে বার করে আধমরা বোনের সামনে ঝুলিয়ে দিয়েছিল ওরা। এই ৪টি ফিল্ম ভারতের মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় এবং বিদেশেও দেখানো হয়েছিল। আমার প্রশ্ন, এই ফিল্মগুলো যখন দেখানো হয়েছিল তখন কলকাতার বুদ্ধিজীবীরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হবে বলে কোনো প্রতিবাদ করেননি কেন?

—রবীন্দ্রনাথ দত্ত,
কলকাতা-৬৪।

ভারত ও হিন্দুত্ব

বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কিছু স্বঘোষিত 'বুদ্ধিজীবী' এবং রাজনৈতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী এমন কিছু বক্তব্য রাখছেন, যা সরাসরি রাষ্ট্রবিরোধী এবং ভারতের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা ও গণতান্ত্রিক কাঠামোর বিরুদ্ধে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা অবশ্যই সংবিধানসম্মত অধিকার, তবে সেই অধিকার যদি দেশের ভিত্তিমূল কাঁপাতে ব্যবহার করা হয়, তাহলে তা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না।

গণতন্ত্র মানে শুধু সরকারের সমালোচনা নয়, তার সঙ্গে থাকে দায়িত্বশীলতা। সরকারবিরোধী মত, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য— এইসবই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য। কিন্তু, কোনো ভারতীয় নাগরিক যদি এমন মন্তব্য করেন যা দেশের সুরক্ষা, একতা ও আন্তর্জাতিক মর্যাদার পরিপন্থী, তবে তা সরাসরি দেশদ্রোহের শামিল।

সাম্প্রতিককালে কিছু ব্যক্তি রাজনৈতিক মঞ্চে কিংবা সামাজিক মাধ্যমে এমন কিছু বক্তব্য রাখছেন, যেখানে কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতা, ভারতের ভূখণ্ড নিয়ে প্রশ্ন তোলা কিংবা ভারতীয় সেনার বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক মন্তব্য সামনে এসেছে। প্রশ্ন উঠছে— কারা এসব করছে? কাদের মদতে করছে?

ফ: ৩

কীসের স্বার্থে তারা দেশের বিরোধিতা করছে?

এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত অবিলম্বে একটি শক্তিশালী ও কঠোর আইন প্রণয়ন করা, যা শুধুমাত্র দেশদ্রোহী বক্তব্য ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ব্যবহার হবে। এই আইন যেন শুধু বক্তব্যকারীর শাস্তির দিকটি নয়, বরং এর পেছনের ষড়যন্ত্রকারী ও অর্থদাতা চক্রকেও গ্রেপ্তারে সহায়তা করে।

যদি আজ দেশবিরোধী মন্তব্যের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তাহলে আগামী দিনে ভারতের ভিত আরও দুর্বল হবে। বাকস্বাধীনতার নামে কেউ যেন স্বাধীনতাকে কুক্ষিগত করতে না পারে, তা নিশ্চিত করতেই আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এখন সময়ের দাবি।

—**কুন্তল চক্রবর্তী,**
কলেজরোড, বনগাঁ, উ: ২৪ পরগনা।

বুলি ও গুলি : দাদা ও দাদাগিরি

দাদাগিরি অনেকটা আরশোলার মতো। প্রাগৈতিহাসিক। পৃথিবীর আদিমতম, প্রবলতম, প্রাণীদের অন্যতম ডাইনোসরের মতো লুপ্ত হয়ে যেতে পারত আরশোলা। কিন্তু চকচকে খয়রি রঙের, লম্বা-উড়ানে অপরাগ এই পতঙ্গ এখনো পৃথিবী জুড়ে বিরাজ করছে। এবং যুগ যুগ পেরিয়ে এসেও আরশোলা নাকি স্বভাব চরিত্রে, চেহারা, শুঁড় ও ডানার আপাত সীমিত ব্যবহারে বিবর্তিত হয়নি। যুগে যুগে হুবুহু 'দাদা' ও 'দাদাগিরি'-র মতো। সর্বযুগে দাদা ও দাদাগিরির একই চেহারা। স্বভাব ও চেহারাটা এইরকম; এরা স্বভাবতই ধমকবাজ। বুঝতে পারে সেইসব মানুষকে— যারা এদের ধমকে চমকাবে, থমকাবে, নত হবে, ভয় পাবে, বাধ্য হবে। ধমকবাজি দাদাগিরির বিশেষ অঙ্গ। কিন্তু ধমক যেখানে তেমন কাজ করছে না, সেখানে দাদাগিরির পরের পদক্ষেপ : জবরদস্তি। অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থে বল প্রয়োগ। একার শক্তিতে কুলোবে না।

সুতরাং ধমকবাজির সঙ্গে চাই দলবাজি। দাদা একলা থাকে না। দাদাকে ঘিরে থাকে সাকরেদ সমর্থকের দল। দলবর্জিত দাদাগিরি অসম্ভব। দাদাগিরি চূড়ান্ত পর্ব যে কোথায় কোন ভয়ংকর শীর্ষ পর্যন্ত যেতে পারে, তা বোঝা যায় এই সময়ের পৃথিবীতে দুই দাদা চূড়ামণির কার্যকলাপ ও জীবন প্রবাহের দিকে তাকালে। এরা ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেছেন। একজন আমেরিকার ডোনাল্ড ট্রাম্প। অন্যজন রাশিয়ার ভ্লাদিমির পুতিন। তবে যেসব দাদা ছড়ি ঘোরানোর ওই পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে না, তারা তুলনায় ছোটো-ছোটো পরিসরে পরোয়াহীন মাস্তানি, গুন্ডামিতে দাদাগিরির চূড়ান্ত রূপ দেখাতে অবশ্যই পারে। দাদাগিরি কিন্তু সব সময় নিন্দনীয় নয়। যাদের স্বভাবের মধ্যে ধমকবাজি থেকে জবরদস্তি, বলপ্রয়োগ থেকে মস্তানি-গুন্ডামি এসব সহজে আসে, আমেরিকায় তাদেরই বলে 'বুলি'।

এই বুলিরাই স্কুল-কলেজে র‍্যাগিং করে। তাদের মস্তানিকে প্রশংসা করে আমেরিকায় গড়ে উঠেছে 'বুলি কালচার'। আবার ইউরোপে যে 'দাদাগিরি' বা 'বুলি সংস্কৃতি' নেই, তা তো নয়। ইতালিকে ইউরোপীয় মস্তান-কালচারের পীঠস্থান বলা হয়। যারা মারিও পুজোর বিখ্যাত উপন্যাস 'দ্য গডফাদার' পড়েছেন কিংবা সেই উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি মার্লন ব্রান্ডো-অভিনীত ফ্রান্সিস কোপোলা পরিচালিত 'গডফাদার' ছবিটা দেখেছেন, তারা অবশ্যই বুঝেছেন দাদাগিরি ইতালিতে কী ভয়ংকর রূপে বিরাজ করে সমাজ-সংস্কৃতি- রাজনীতির ক্ষেত্রে। যারা এই ধরনের দাদাগিরি করে 'বুলিবয়' বলে খ্যাত হয়, তারা রাজনীতির সঙ্গে জড়ায়।

মার্কিন ইংরেজিতে 'Bully' শব্দটি 'চমৎকার' অর্থেও ব্যবহার হয়, যেমন 'হোয়াট এ বুলি এক্সপ্রেশন।' বুলিবয় 'হলো সেই মানুষ যে নিজের ক্ষমতা, প্রভাব, মুখের জোর, শরীরের জোর এবং মস্তানির জোর প্রয়োগ করে কাজ হাসিল করতে পারে এবং জুলুম করে টাকা আদায় করতেও পারে। পৃথিবী জুড়ে এই দাদা বা বুলিবয়ের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বাড়ছে। কেননা, এদের ছাড়া এ যুগের রাজনীতি সম্ভবত খোঁড়া। 'বুলি' ও গুলি এখন বিশ্বজুড়ে রাজনীতির স্টিয়ারিং।

—**সুপ্রভাত বটব্যাল,**
লাভপুর, বীরভূম।

মতুয়ারা কি হিন্দু নয়?

মতুয়ারা সরল ও বিশ্বাসী। এরা নির্দোষ। দোষ মতুয়া রাজমাতা রাজপুত্রদের তেমনি সিস্টেমের। গুরু হরিচরণের বংশধররা অনুকূল সম্প্রদায় ও ইসলামি অনুকরণে মতুয়া-খলিফা রাজ গড়তে চায়। গুরু হরিচরণ কিন্তু এটা চাননি।

এখন যদি কেউ মতুয়াদের দোষী করে, সেটা অন্যায় হবে। গুরু হরিচরণের বংশধরদের কেউ কেউ সেটাকে পুঁজি করে, মতুয়াদের বিদ্রোহী যে করবে না, সেটা কে বলতে পারে?

একজন মতুয়া ঘনিষ্ঠ জানিয়েছে, এরা নিজেদের আর হিন্দু ভাবেন না, যেমন পাকিস্তানের শূদ্রদের সমাজমাধ্যমে পাকিস্তান সরকার হিন্দু হিসাবে স্বীকৃতি দেয়নি, আজ তাদের আলাদা করে ইসলামে কনভার্ট করেছে। একই অবস্থা মতুয়াদেরও হবে। যদি এরা নিজেদের হিন্দুই না ভাবে, বাংলাদেশ ছেড়ে অবৈধ ভাবে হিন্দুস্থানে আসার ও নাগরিকত্ব চাওয়ার পক্ষে যুক্তি কী— এই প্রশ্ন এখন সবার।

বাইরে থেকে জনগণ মতুয়াদের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার কলহ নিয়ে, যত চুপ থাকবে, তত এরা নিজেদের কলহ নিয়ে ভাববে, এক সময় অনন্ত দুটা গ্রুপ হবেই, এক গ্রুপে বংশ পরম্পরায় সমাজপতি অস্বীকার করবে। কাজেই সবাইকে অনুরোধ তাদের নিয়ে কোনো মন্তব্য করবেন না।

—**মৃণাল মজুমদার,**
বার্লিন, জার্মানি।

মাতৃশক্তি

সুতপা বসাক ভড়

মানুষের জীবনে বেশ কয়েকটি অধ্যায় আছে। নানান ঘটনার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়ে চলে সেই অধ্যায়গুলি। ব্যস্ততার মধ্যে সবসময় হয়তো সেগুলির হিসেবনিকেশ করে উঠতে পারা যায় না। আবার কখনো-বা আপাতদৃষ্টিতে মুখ্য হলেও ছোটোখাটো ভেবে অতটা গুরুত্বও দেওয়া হয়ে ওঠে না। তেমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো এই পৃথিবীতে আমাদের জন্মগ্রহণ। মাতৃগর্ভের বাইরে এসে আমরা সর্বপ্রথম 'মা'কেই ডেকে উঠি— অতি স্বাভাবিক, কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা! 'মা' হলেন শক্তির অংশ। সেই 'মা', যিনি সন্তানকে নিজগর্ভে ধারণ করার সময় থেকেই তার মধ্যে সংস্কারের বীজ বপন করতে থাকেন; যিনি গর্ভাবস্থা থেকেই সন্তানের শারীরিক ও মানসিক স্থিতির ভিত্তি স্থাপন করেন। সন্তান জন্মের পরে নিজ শারীরিক দুর্বলতা অগ্রাহ্য করে প্রত্যেক মা তাঁর শিশুর লালন-পালনকে নিজের একটি অন্যতম প্রধান কর্তব্যরূপে পালন করে থাকেন। এই গুরুদায়িত্ব ঈশ্বর কেবলমাত্র নারীকেই অর্পণ করেছেন। কারণ নারী হলো শক্তির অংশ। একাধারে নরম, পেলব, কমনীয়, রমণীয় বাহ্যিক প্রকাশ, অপরদিকে শক্তির অপারস্রোত— যিনি একাধারে সৃষ্টিকর্ত্রী ও পালনকর্ত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণা।

আমাদের পরিবারে যখন কন্যাসন্তানের আবির্ভাব হয়, তখন আমরা সেই কন্যাসন্তানের মধ্যেই মাতৃভাবের প্রত্যক্ষ প্রকাশ দেখতে পাই। ছোট্ট শিশুটি খেলার ছলে, ভালো করে চলা কিংবা কথা বলা শেখার আগেই নিজ প্রিয়জনের মুখে খাবারের হাত তুলে ধরে। তার নিজের প্রিয় খাবারটি তুলে দিতে চায় প্রিয়জনদের মুখে। একটু বড়ো হয়ে মেয়েটি খেলনা-বাটি নিয়ে খেলতে বসে, আমরা হয়তো হালকাভাবে তার খেলা দেখি, কিন্তু যে খুবই যত্নের সঙ্গে বাড়ির সকলের জন্য রান্নায় ব্যস্ত— ঘর-সংসার নিয়ে ছোট্ট পালনকর্ত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। আরও একটু বড়ো হলে শুরু হয় পুতুলখেলা, খেলার পুতুলগুলি হয়ে ওঠে তার সন্তানসন্ততি। তাদের যত্ন করা, বিয়ে দেওয়া খেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেসকল সংস্কার ও পরম্পরা তার মধ্যে অনুসৃত হচ্ছে, সেগুলির অপূর্ব প্রকাশ। এর মাধ্যমে বাৎসল্য রসের প্রভাবও দেখছি। একথা অনস্বীকার্য যে, বাহ্যিক প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের দেশে ছোটো ছোটো মেয়েদের আমরা এইরকম ভাবেই দেখতে অভ্যস্ত। একটু বড়ো হলে তাদের মধ্যে বাহ্যিক পরিবেশের প্রভাব পড়ে, স্বতঃস্ফূর্তভাবের অভাব দেখা যায়। আবার গার্হস্থজীবনে দেখা যায়, তারা অক্লান্তভাবে কার্যক্ষেত্র ও পরিবারের মধ্যে সমতা বজায় রেখে চলেছে। পরিবারের যত্ন নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কার্যক্ষেত্রেও আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপন করে ফেলে। ফলস্বরূপ, এক আন্তরিক সম্পর্কের আবহে তারা সহকর্মীদের সহযোগিতায় এগিয়ে চলে সাফল্যের পথে। বিভিন্ন পেশায় মহিলা প্রবন্ধকেরা অনেক বেশি অনুভবী ও পারদর্শিনী হয়ে থাকেন।

এই পর্যন্ত সবকিছু ঠিক আছে, কিন্তু তাদের ওপর এত অত্যাচার, হিংস্রতা কেন? মহিলা যারা হিংসার শিকার হন, তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে জন্মগত সংস্কারের জন্য আক্রমণকারীর ওপর প্রত্যাঘাত করতে পারেন না। তাদের পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন হয় যে, আক্রমণকারী তাদের চূড়ান্ত ক্ষতিসাধন করতে এসেছে। এই দুর্বলতার সুযোগ নেয় দুর্বৃত্তেরা। তবে মেয়েরা এখন সচেতন হয়েছে, নিজেদের ভেতরের শক্তিকে চিনতে শিখেছে। তারা জানে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হয়। সেই কারণে, তারাও শারীরিকভাবে সশক্ত হওয়ার জন্য প্রত্যেকেই আত্মরক্ষার অস্ত্রও ধারণ করে। কারণ তারা জানে যে শক্তির দ্বারাই দুর্বৃত্তদের প্রতিহত করা যায়। সেজন্য বর্তমান নারীপ্রজন্ম আজ সর্বপ্রকার বিপরীত পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার জন্যও প্রস্তুত। তাদের মধ্যে যেমন নমনীয়তা, কমনীয়তা আছে, তেমনই আছে শক্তির রণচণ্ডীরূপও। সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি সর্বক্ষেত্রে আমরা দেখছি মাতৃশক্তির প্রকাশ। আজাদ-হিন্দ-ফৌজ থেকে বর্তমান সেনাবাহিনী দেখতে পাই গ্রামেই শক্তির উজ্জ্বল উপস্থিতি। পাকিস্তানের জেহাদি উগ্রপন্থীরা যখন আমাদের ভাইদের শুধুমাত্র হিন্দু হওয়ার জন্য কাপুরুষের মতো হত্যা করে, তখন সেই হত্যাকারীদের সমূলে বিনাশ করতে উদ্যত হয়েছেন দুই মাতৃশক্তি উইং কমান্ডার ভূমিকা সিংহ এবং কর্নেল সোফিয়া কুরেশী। সাফল্যের সঙ্গে অপারেশন সিঁদুরের নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁরা, শত্রুর আকাশে উড়ে তাদের ঘাঁটিগুলিকে তছনছ করেছেন তাঁরা। ইতিহাস যেমন সাক্ষী আছে সীতা ও দ্রৌপদীর অপমানের, তেমনই সাক্ষী আছে ওই অপমানের শাস্তিস্বরূপ রামায়ণ ও মহাভারতের ভয়ংকর যুদ্ধের। মাতৃশক্তির অপমান, অসম্মান হলো অসহনীয়। মনু বলেছেন :

যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়া।।

ছোটোদের মধ্যে স্থূলতা এবং প্রতিকারের উপায়

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

অনেক বাবা-মা ভেবে থাকেন, বাচ্চা যত গোলগাল হবে, সে তত সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। কিন্তু অধিকাংশ সময় অতিরিক্ত ওজন বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। বাচ্চার স্বাস্থ্য নিয়ে প্রত্যেক বাবা-মা চিন্তা করেন। স্থূলতা এমন একটা সমস্যা যা অনেক সময় নজর এড়িয়ে যায়। বাচ্চার উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওজন বাড়ে, তবে তা সঠিক অনুপাতে বাড়ছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখা জরুরি। না হলে কখন আপনার বাচ্চা মোটা হয়ে যাবে আপনি বুঝতেও পারবেন না।

দেহের ওজন কেন বাড়ে : দৈহিক ওজন বৃদ্ধির মূল কারণ হলো গৃহীত শক্তি ও তার ব্যবহারের মধ্যে অসঙ্গতি। আমাদের গৃহীত প্রায় প্রতিটি খাবারেই শক্তি ক্যালরি হিসেবে থাকে। আমরা আমাদের পছন্দ, সামর্থ্য ও অভ্যাস অনুযায়ী খাদ্যগ্রহণ করে থাকি। মানুষের বয়স, লিঙ্গ, ওজন আর দৈনন্দিন কাজের ওপর শরীরের ক্যালরির চাহিদা নির্ভর করে। প্রকৃতপক্ষে কেউ যদি তার প্রাত্যহিক চাহিদার চেয়ে বেশি ক্যালরি প্রতিদিন বা প্রায়ই খাবারের মাধ্যমে গ্রহণ করে, তবে তার বাড়তি অংশ শরীরে মেদ হিসেবে জমতে থাকবে। প্রয়োজনের তুলনায় বেশি খাবার খেলে শক্তি গ্রহণের তুলনায় যদি ক্যালরি খরচ কম হয় তাহলে দেহের ওজন বাড়তে থাকবে। আমাদের দেহের ভেতরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাজ করার জন্য প্রতি মিনিটে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্যালরি ব্যবহার করে।

আমরা আমাদের গৃহস্থালি কাজকর্ম থেকে শুরু করে রাস্তায় হাঁটাচলা, খেলাধুলা, ছোটাছুটি, কর্মক্ষেত্রের কাজকর্ম এবং কথা বলতেও ক্যালরি ব্যবহার করে থাকি। এই ক্যালরি গ্রহণ ও ক্যালরি ব্যবহারের মধ্যে একটি ভারসাম্য থাকতে হবে। প্রতিটি মানুষেরই তার সারাদিনের ক্যালরি চাহিদার কাছাকাছি পরিমাণ ক্যালরি খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে গ্রহণ করার চেষ্টা করতে হবে। বাড়ন্ত ছেলে-মেয়ে ও গর্ভবতী মায়েদের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়। এছাড়া সবার জন্য চাহিদা হিসেবে খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস করাটা জরুরি। কারও কারও আবার খাদ্য উপাদান পরিবর্তনের বিশেষ দরকার হয়।

কী করে বুঝবেন যে আপনার বাচ্চা স্থূল : নিয়মিত বাচ্চার দৈহিক ওজন মাপুন। প্রত্যেক বয়সের জন্য একটা কাঙ্ক্ষিত দৈহিক ওজন আছে। যদি আপনার বাচ্চার ওজন তার জন্য নির্দিষ্ট মাপের থেকে ২০ শতাংশের বেশি হয়, তা হলে বুঝবেন বাচ্চার ওবেসিটির সমস্যা রয়েছে। বেসাল মেটাবলিক পার্সেন্টাইল চার্ট ব্যবহার করেও ওবেসিটি মাপা যায়। আপনার বাচ্চার মেটাবলিক ইনডেক্স যদি ৯৫ পার্সেন্টাইলের উপরে হয়, তাহলে জানবেন আপনার বাচ্চা ওবেস গ্রুপে পড়ে।

ওবেসিটি রিস্ক ফ্যাক্টর : বাচ্চারা আজকাল খুব একটা খেলাধুলা বা ছোটাছুটির সুযোগ পায় না। বাড়িতে বসে ইন্টারনেট সার্ফ বা ভিডিয়ো গেম খেলা বা টেলিভিশন দেখাটাই তাদের কাছে প্রধান আকর্ষণ। এ রকম শারীরিক শ্রমহীন জীবনযাপনের জন্য যথারীতি বাচ্চাদের ওজন বাড়তে থাকে এবং ক্রমশ তারা ওবেসিটির দিকে এগোয়।

টিভি দেখাটা বাচ্চাদের কাছে প্রায় একটা অ্যাডিক্শন। খেলাধুলা ছেড়ে বাচ্চারা বাড়িতে বসে টিভি দেখাটা বেশি পছন্দ করে। আর টিভি দেখতে দেখতে চিপস, চকোলেট, পপকর্নের মতো মুখরোচক খাবার খাওয়া এখন রীতিমতো অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। একদিকে ক্যালরি গ্রহণ বৃদ্ধি, অন্যদিকে খেলাধুলার প্রতি অনীহা, সব মিলিয়ে ওজন দ্রুত হারে বাড়তে থাকে। বাচ্চাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তারা কী খেতে ভালোবাসে, বেশিরভাগ বাচ্চাই উত্তর দেবে, চকোলেট, কোল্ডড্রিংক, আইসক্রিম, রোল। আর কেক পেস্ট্রি তো আছেই। এক কথায় জাঙ্কফুড। এসব খাবারের মধ্যে ক্যালরির পরিমাণ খুব বেশি থাকে যা স্বাভাবিকভাবেই ওজন বাড়িয়ে দেয়।

বাচ্চারা সাধারণত বাবা-মাকে দেখে অনেক কিছু শেখে। আর আজকের দিনে বাবা-মায়েরাই যেহেতু শারীরিক শ্রমব্যায়াম বা এক্সারসাইজের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়ে। ফলে দৈহিক স্থূলতা অর্জন বা ওবেসিটি হয়ে ওঠে অন্তিম ফলাফল। বেশিরভাগ পরিবারেই আজকাল বাচ্চার সংখ্যা ১ বা ২ থাকে। ফলে বাবা-মায়ের একটু বেশি তাদের আদরযত্ন করে থাকেন। বাচ্চার স্বাস্থ্য ভালো হবে এ ভেবে অনেক সময় তারা বেশি করে বাচ্চাকে খাওয়াতে থাকেন। শুধু বাচ্চাকে খুশি করতে তার যা খেতে ইচ্ছা করে সেই খাবার নিমিষে হাজির হয়ে যায়, তা সে যতই হাই ক্যালরিযুক্ত খাবার হোক না কেন।

চাইল্ডহুড ওবেসিটির ক্ষতিকর প্রভাব : ছেলেবেলায় যদি কোনো বাচ্চা অতিরিক্ত মোটা হয়, বড়ো হয় ওজন আরও বাড়তে পারে, ফলে নানারকম অসুখ যেমন করোনারি হার্ট ডিজিস, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন ইত্যাদি হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়। অতিরিক্ত ওজনের ফলে বাচ্চা সহজেই ক্লান্ত এবং কর্ম উদ্যমহীন হয়ে পড়ে। অনেক সময় মোটাসোটা বাচ্চারা স্কুলের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে পুরোপুরি অংশগ্রহণ করতে পারে না। কখনো কখনো অন্য বাচ্চারাও নানারকমভাবে স্থূলকায় বাচ্চাদের টিজ করে। ফলে ওদের মধ্যে হীনম্মন্যতাবোধ বা মানসিক চাপ দেখা যায়।

কী করে ওবেসিটি আটকাবেন : ৬ মাস বয়স পর্যন্ত বাচ্চাকে শুধু মায়ের বুকের দুধ খাওয়ান, এতে মোটা হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। বাচ্চাকে স্বাস্থ্যকর খাবার অভ্যাস গড়ে তুলতে উৎসাহিত করুন। সুষম খাদ্যের ওপর নজর দিন। খেয়াল রাখবেন যেন খাদ্যে প্রোটিন, ভিটামিন, মিনারেল পরিমাণ মতো থাকে। কোনো কিছুরই আধিক্য যেন না থাকে, তা হলেই বাচ্চা ভালোভাবে বেড়ে উঠবে। টিভি দেখতে দেখতে বাচ্চার চিপস্, সফট ড্রিংক্স খাওয়ার অভ্যাসকে প্রশ্রয় দেবেন না। আউটডোর গেমস খেলতে বাচ্চাকে উৎসাহ দিন। বাড়িতে জাঙ্কফুড আনা বন্ধ করুন। ☐

ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা ঘিরে নির্বাচন কমিশননের বিরুদ্ধে সোচ্চার বিরোধীরা

কেন এত ভয় ?

ফি বছর লক্ষ লক্ষ অনুপ্রবেশকারীকে জাল নথি পাইয়ে দিয়ে 'দেশি' করে ফেলছেন শাসকদলের নেতারা, তারাই থাবা বসাচ্ছে এ রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দাদের পেটের ভাতে।

প্রণবজ্যোতি ভট্টাচার্য

অভিযানের নাম বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা, সংক্ষেপে 'এসআইআর'। কেন্দ্রীয় সরকার পক্ষের দাবি, এটি হলো 'ভোটার তালিকার সাফাই অভিযান'। আর তুষ্টীকরণের রাজনীতি করা বিরোধীদের দাবি, 'জবাই হচ্ছে গণতন্ত্র'। কংগ্রেসের ডিএনএ থেকে জন্ম নেওয়া পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস আরও একধাপ এগিয়ে বলছে 'ভয়ংকর ষড়যন্ত্র'। প্রশ্ন হলো, কী এই এসআইআর? এক কথায় উত্তর হলো, এটি নির্বাচন কমিশন কর্তৃক পরিচালিত একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ করা হয়। এসআইআর প্রক্রিয়াটি নাগরিকত্ব যাচাইয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় এটি একটি সংবেদনশীল বিষয় হয়ে উঠেছে। তার জেরেই গেল গেল রব তুলেছে বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, ঈশান কোণে সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরাচ্ছেন বিরোধী দলগুলির নেতারা।

পশ্চিমবঙ্গ-সহ গোটা দেশে শেষবার এসআইআর হয়েছিল ২০০২-০৩ সালে। সদ্যই এই কাজ শেষ হয়েছে বিহারে। পশ্চিমবঙ্গ-সহ বাকি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে শুরু হতে চলেছে এই কাজ। এর পরেই গেল গেল রব তুলে সোচ্চার হয়েছেন বিরোধীরা। এর প্রধান কারণ হলো, বিহারে এসআইআর প্রক্রিয়ার খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে প্রায় ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম। ২০০২ সাল থেকে এরা দিব্যি ছিল ভোটার তালিকায়। অর্থাৎ এদের একটা বড়ো অংশই অংশগ্রহণ করেছেন নির্বাচনে। সে তিনি নিজের ভোট নিজেই দিন, কিংবা তাঁর হয়ে ভোট দিয়ে দেয় কোনো রাজনৈতিক দলের আশ্রয় ও প্রশ্রয় প্রাপ্ত মস্তানরা। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, যাঁরা বেশ কয়েক বছর আগে মারা গিয়েছেন, ভোটার তালিকায় জ্বলজ্বল করছে তাঁদের নামও। বিজেপির অভিযোগ, এই সুযোগটাকেই কাজে লাগিয়ে ছাপ্পা ভোট দিয়ে গদি আঁকড়ে পড়ে রয়েছে অবিজেপি-শাসিত বিভিন্ন রাজ্যের শাসক দল।

এসআইআর প্রত্যাহারের দাবিতে সোচ্চার হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধী ২৬টি রাজনৈতিক দলের জোট 'ইন্ডি'। এই ইন্ডি জোটেই রয়েছে তৃণমূলও। ছাব্বিশে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে তৃণমূল শাসিত পশ্চিমবঙ্গে। তার জেরে সব চেয়ে বেশি ভয় বোধহয় পেয়েছে তৃণমূল। সেই কারণেই কলকাতায় ২১ জুলাইয়ের সমাবেশ মঞ্চে এসআইআরের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই সভা থেকে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর-এ বৈধ ভোটারদের নাম বাদ গেলে ঘেরাও করা হবে নির্বাচন কমিশনের দপ্তর। সেই মোতাবেক সম্প্রতি এই প্রস্তাব পেশ করেন তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। সেই প্রস্তাব গ্রহণও করেছিলেন

ইন্ডি জোটের নেতারা। ওই কর্মসূচিতে পোস্টারের ভাষা কী হবে, তাও ঠিক করে দিয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন, 'এসআইআর হলো সাইলেন্ট ইনভিজিব্‌ল রিগিং'। তাঁর সেই কথা ধরেই এসআইআর-কে 'চুপি চুপি ভোটে কারচুপি' বলে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল।

তবে বিরোধীদের এসব প্রতিবাদে কোনো কাজ হবে না বলেই নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর। জানা গিয়েছে, ভোটার তালিকায় থাকা নামের মধ্যে কারা মৃত, কারা অন্যত্র চলে গিয়েছেন, ভুয়ো ভোটারই-বা কারা, বাড়ি বাড়ি গিয়ে তা সমীক্ষা করে দেখবেন কমিশনের লোকজন। কমিশন সূত্রে খবর, সিইও-র নেতৃত্বে জেলা নির্বাচনী আধিকারিক বা জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক, ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার, অতিরিক্ত ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার এবং বুথ লেভেল অফিসাররা একত্রে ভোটার তালিকায় নাম থাকা প্রত্যেক ভোটারের বাড়ি গিয়ে সমীক্ষার কাজটি করবেন। এতে একটি ফর্ম ফিল-আপ করে প্রয়োজনীয় তথ্য দাখিল করতে হবে ভোটারদের। পরে সেটি যাচাই করা হবে।

তবে ২০০২ সালের ১ জানুয়ারি প্রকাশিত এসআইআর তালিকায় যাঁদের নাম রয়েছে, তাঁদের অতিরিক্ত নথি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আবার যাঁদের অভিভাবকদের নাম সেই তালিকায় রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রেও সমস্যা নেই। তবে সেই তালিকায় যাঁদের নাম নেই, নয়া ভোটার কিংবা অন্য রাজ্য থেকে চলে আসা কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে আলাদা ফর্ম পূরণ করতে হবে, দাখিল করতে হবে প্রয়োজনীয় নথিও। ২০০২ সালের তালিকায় যাঁদের নাম নেই, তাঁদের পারিবারিক ও এদেশের নাগরিকত্বের যোগসূত্র খুঁজতে যাচাই করা হবে নথি। পুরো প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকবেন রাজনৈতিক দলগুলির বুথ লেভেলের প্রতিনিধিরাও।

তার পরেও কেন গণতন্ত্র জবাই হচ্ছে বলে রব তুলেছেন বিরোধীরা? কেনই-বা এসআইআর প্রত্যাহারের দাবি তুলছেন তাঁরা? তাঁরা কি চান না বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচন হোক স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ? অথচ লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী বলেন, 'এই লড়াই রাজনৈতিক নয়, বরং সংবিধান রক্ষার লক্ষ্যে। এই লড়াই এক ব্যক্তি, এক ভোটের জন্য এবং আমরা একটি পরিষ্কার, বিশুদ্ধ ভোটার তালিকা চাই।'

রাহুল যা চান, প্রযুক্তিসম্পন্ন মানুষ তো তাই চায়। বলা ভালো, নির্বাচন কমিশনও তো সেটাই চায়। তার পরেও এসআইআর প্রত্যাহারের দাবি উঠছে কেন? কেনই-বা তৃণমূল এ নিয়ে সুর চড়াচ্ছে? রাজনৈতিক মহলের মতে, বছর ঘুরলেই এ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। এসআইআর হলে বাদ যাবে প্রায় ২ কোটি ভোটারের নাম। ২০০৩ সালে এসআইআরের পর যেসব অনুপ্রবেশকারী ঢুকেছে পশ্চিমবঙ্গে এবং তৃণমূলের জমানায় যারা বেনোজলের মতো ঢুকেছে এ রাজ্যে, তাদের সিংহভাগই হয় বাংলাদেশি মুসলমান, নয়তো রোহিঙ্গা মুসলমান। প্রথমে বাম এবং পরে তৃণমূলের নেতারাই এদের জাল নথি বানিয়ে এ রাজ্যের 'স্থায়ী বাসিন্দা করে দিয়েছে। যার জেরে তারা যেমন রেশন-সহ সরকারের নানা দাক্ষিণ্য পাচ্ছে, তেমনি ভোট দিয়ে ঋণ শোধ করছে শাসক দলের নেতাদের। এরাই বিভিন্ন বুথে গিয়ে ছাপ্পা ভোট দেয়, এই অনুপ্রবেশকারীরাই ভোটের দিন শাসক দলের নেতাদের অঙ্গুলিহেলনে ভোটারদের রক্তচক্ষু দেখিয়ে বলে, 'লাইন ছেড়ে চলে যান, আপনার ভোট হয়ে গিয়েছে'।

যিনি ভোটার তিনি দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে পরে জানতে পারেন, তাঁর ভোট হয়ে গিয়েছে। তাঁর হয়ে ভোট দেওয়ার মহান কর্তব্যটি করে দিয়েছে পাড়ারই পচা, ভাইটুরা। এই অনুপ্রবেশকারীরাই ভোটের দিন বুথের সামনে বোমা ফাটিয়ে ভোটারদের ঘরে পাঠিয়ে নিশ্চিন্তে ছাপ্পা মেরে দেয়। একে তো প্রাণের ভয়, তার ওপর চাকরি বাঁচানোর দায়, সর্বোপরি, 'চুলোয় যাক গণতন্ত্র' মার্কা মনোভাব নিয়ে নির্বিকার চোখ-কান বুজে বসে থাকেন প্রিসাইডিং অফিসার-সহ ভোট কেন্দ্রের বাকি কর্মীরা। এই ত্রিফলায় পোয়াবারো হয় পচা, ভাইটুদের। শাসক দলের ছত্রছায়ায় থেকে তারা যাতে মৌরসিপাট্টা চালাতে পারে, তাই বছরের পর বছর ধরে কুকীর্তি করে চলে তারা। আর দিব্যি গতি আঁকড়ে বসে থাকেন শাসক দলের নেতারা। ভোটের পরে এদের পুরস্কারও দেওয়া হয়। কোথাও সস্তার মুরগি-মাংস, ভাত, কোথাও আবার গরম গরম খাসির ঝোল দিয়ে ঢেকুর তুলতে তুলতে পরবর্তী নির্বাচনে কী করতে হবে, তার আঁক কষতে শুরু করে পচা, ভাইটুরা।

তাই এসআইআর হলে সব চেয়ে বেশি বিপাকে পড়বে অবিজেপি শাসিত বিভিন্ন রাজ্যের শাসক দল। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, তাই তারাই সব চেয়ে বেশি সোচ্চার হয়েছে এসআইআর নিয়ে। প্রায় দু'যুগ এসআইআর না হওয়ার সুফল কুড়িয়েছে এই রাজনৈতিক দলগুলি। বহিরাগতদের কল্যাণে (ভুয়ো নথি দিয়ে যাদের দেশীয় তকমা দেওয়া হয়েছে) যারা বছরের পর বছর ধরে করেকম্মে খাচ্ছে, তারা। রাজনৈতিক মহলের মতে, পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর হলে বাদ যাবে বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম। তখন আর কেউ জিততে পারবেন না ছ' লক্ষ-সাত লক্ষ ভোটে। কেউ আর দাঁত বের করে বলতে পারবেন না, হুঁ হুঁ বাবা, উন্নয়নের কারণেই বছরের পর বছর জিতে চলেছি আমরা। কারণ, রাজ্যে যদি প্রকৃতই উন্নয়ন হতো তাহলে দু'টো পেটের ভাত জোগাড়ের জন্য ঘর-সংসার ফেলে ভিন রাজ্যে গিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতে হতো না পশ্চিমবঙ্গের যুবকদের। এই যে ফি বছর লক্ষ লক্ষ অনুপ্রবেশকারীকে জাল নথি পাইয়ে দিয়ে 'দেশি' করে ফেলছেন শাসকদলের নেতারা, তারাই থাবা বসাচ্ছে এ রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দাদের পেটের ভাতে।

তাই কাজের খোঁজে ভিন রাজ্যে ছুটতে হচ্ছে এ রাজ্যের তরুণ-তরুণীদের। ভোটের আগে তাঁরা যাতে ঘরে ফেরেন, তাই পরিযায়ী শ্রমিক-ভাতাও চালু করা হচ্ছে। এতে মাস গেলে মিলবে হাজার পাঁচেক টাকা। অর্থাৎ দিন প্রতি ২০০ টাকারও কম। এই টাকায় সংসার চালিয়ে ছেলে-মেয়ের পড়াশোনা কীভাবে চালাবেন, তা বুঝতে পারছেন না পরিযায়ী শ্রমিকরাও। তাই এঁদের সিংহভাগই আর এরাজ্যে ফিরবেন না। তাঁরা ধরে ফেলেছেন রাজ্যের শাসক দলের ফন্দি। নানারকম 'শ্রী'যুক্ত ভাতা দিয়ে বস্তুত ভিখিরি করে রাখবার মতলব এঁটেছে তৃণমূল নামক রাজনৈতিক দলটি। যে দলের একাধিক নেতা নানা কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে জেলের ঘানি টানছেন। কেউ আবার ধরা পড়ার ভয়ে সর্বক্ষণ জপছেন ইষ্টদেবতার নাম। দলীয় নেতাদের এই কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি থেকে রাজ্যবাসীর নজর ঘোরাতে প্রয়োজন একটা আন্দোলনের।

সেই আন্দোলনের যৌক্তিকতা থাকুক কিংবা না থাকুক, আন্দোলন করতেই হবে পিঠ বাঁচাতে। জনগণ ক্ষেপে গেলে যে বিষম বিপদ। তখন তো আর ক্ষমতার শীর্ষে বসে ক্ষীর খাওয়া যাবে না। তখন তো আর বিক্রি করা যাবে না চাকরি কিংবা রেশনের চাল। অতএব, নানা ছুতোনাতায় আন্দোলন করো। সেজন্য প্রয়োজনে সংবিধান না মানলেও চলবে। না হলে কি আর একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলতে পারেন, 'এসআইআর পরিচালনার নামে এনআরসি চালু করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিয়ে যদি কাউকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তবে আমরা তা সহ্য করব না।' বিশেষ নিবিড় ভোটার সমীক্ষায় তাই এত ভয় বিরোধীদের। ■

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

বিরোধিতার আওয়াজ কখনোই দমে যাবে না— এটাই ভারতীয় গণতন্ত্রের বিশেষত্ব। যদি 'ঠাকুরঘরে কে, আমি তো কলা খাইনি' গোছের বিরোধিতাও হয়, তখনও সংকীর্ণতার গণ্ডি অতিক্রম করে সেই যথেচ্ছ রকম বিরোধিতা কিন্তু সহনীয় হতে পারে। কিন্তু ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে, অরাজকতা সৃষ্টির ছক কষে যদি সরকার, প্রশাসন, বিচারবিভাগ এমনকী নির্বাচন কমিশনের মতো স্বশাসিত, সাংবিধানিক সংস্থারও বিরুদ্ধাচরণ করা হয় এবং দেশজুড়ে তৈরি করা হয় চরম নৈরাজ্য, তবে দেশের আইন-কানুন, সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার বিরোধী সেই ষড়যন্ত্র কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। সম্প্রতি বিহারে সংঘটিত হয়েছে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন। ভোটার তালিকা সংশোধনের এই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে এমনই এক তুমুল রাজনৈতিক বিরোধিতা শুরু করেছে ইন্ডিজোটের সব শরিকরা, তাও আবার এক সুরে। অথচ পশ্চিমবঙ্গে এই তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেস একটা বিধানসভা আসন নিয়ে বিগত দিনে রীতিমতো বাঁদরের পিঠে ভাগ করেছে। অথচ দেশের গণতন্ত্র সুরক্ষায় যেই না বিহারে ভোটার তালিকায় এই বিশেষ নিবিড় সংশোধন শুরু হলো, অমনি বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্র যেন রসদ পেল। বিহারে যখন লালুপ্রসাদ যাদবের জমানায় দুর্নীতি হয়, পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতির হিমালয়ের সন্ধান মেলে, খোঁজ পাওয়া যায় জঙ্গি ঘাঁটির, অথবা কেরালায় যখন সোনাপাচার চক্রের সন্ধান পাওয়া যায়, তখন না তৃণমূল চিৎকার করে তেজস্বী যাদবের বিরুদ্ধে, না তেজস্বী তেজ দেখায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, স্তালিন বা হেমন্ত সোরেনের বিরুদ্ধে। রাহুল গান্ধী কখনও 'চেতনা মার্চ' করেন না স্তালিন বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে। এর কারণ কী? ইন্ডিজোটে এরা হলো পরস্পরের জোটসঙ্গী এবং আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত হয়েও সততার স্বঘোষিত পরাকাষ্ঠা। ভারতীয় 'গণতন্ত্র' রক্ষায় একজোট হয়েছে বলে এই বেশিরভাগ পরিবারতান্ত্রিক দলগুলির দাবি! তাই বিহারে বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ শুরু হতেই রাহুল গান্ধী এবং ইন্ডিজোটের পক্ষ থেকে 'ভোট চোরি'-শীর্ষক অপপ্রচার শুরু হয়। তাদের বক্তব্য হলো ভোটার তালিকায় এই সংশোধনী হলো ভোট চুরির কৌশল। ডিএমকে-র কানিমোঝি থেকে পিডিপি-র মেহবুবা মুফতি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে রাহুল গান্ধী— সবাই আপাতত এই ইস্যুতে আন্দোলনরত এবং তাদের প্রধান টার্গেট হলো কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের অফিস এবং সংসদ ভবন। বিহারে ভোটার তালিকায় যেহেতু বিশেষ নিবিড় সংশোধন হলো, তাই বিহার বিধানসভাও এখন এই সংশোধনীর কাজের বিরোধিতার স্বর রেওয়াজের উর্বর ভূমি। বিশেষ নিবিড় সংশোধন আর কিছু পারুক, না পারুক, লোকসভা নির্বাচনের পর এই প্রথম আবার সব বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিতে একত্রিত করেছে। যদিও কোনো সাধু উদ্দেশ্য তাদের একজোট করেনি। একত্রে দাঁড়িয়ে, নির্বাচন কমিশনের প্রতিটি পদক্ষেপের যুক্তিহীন বিরোধিতার সুযোগে বেশিরভাগ আঞ্চলিক দলগুলি জাতীয় স্তরে বিরোধ প্রদর্শনের সুযোগ পাচ্ছে। এই বিরোধে চোখে পড়ছে তাদের শৌখিনতা ও উদ্ভাবনীশক্তি। গত ৬ আগস্ট, নির্বাচন কমিশনের বিরোধিতার ডাক দিয়ে তার ইন্ডিজোটসঙ্গীদের একটি নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানান লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। যেন চেটেপুটে, কবজি ডুবিয়ে খাওয়াদাওয়া করে রাজনৈতিক মশলা মাখানো ইস্যুটাকে মানুষকে খাওয়ানো যায়। দেখা যাচ্ছে কংগ্রেস নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গেও নির্বাচন কমিশনের এই বিশেষ নিবিড় সংশোধনের বিরুদ্ধে বেশ প্রো-অ্যাকটিভ।

এখন স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসে কয়েকটি প্রশ্ন। 'বুথ লেভেল অফিসার' নিয়োগের নিয়মটি কাদের শাসনকালে তৈরি হয়? কেন এই নিয়ম তৈরি হয়? তখন দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার কে ছিলেন? এর উত্তর হলো— সময়টা তখন ছিল ২০০৯ সাল। অর্থাৎ ইউপিএ-২ সরকার তখন ক্ষমতায়। দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার তখন নবীন চাওলা। এই নিয়ম চালু করার বিষয়টি সম্পর্কে তখন তিনি বলেন— 'We decided to adopt a completely new method to ensure as accurate an electoral roll as possible, particularly to counter the effect of people moving between states, cities, and within cities, often beyond the jurisdiction of election office due to their movements.'

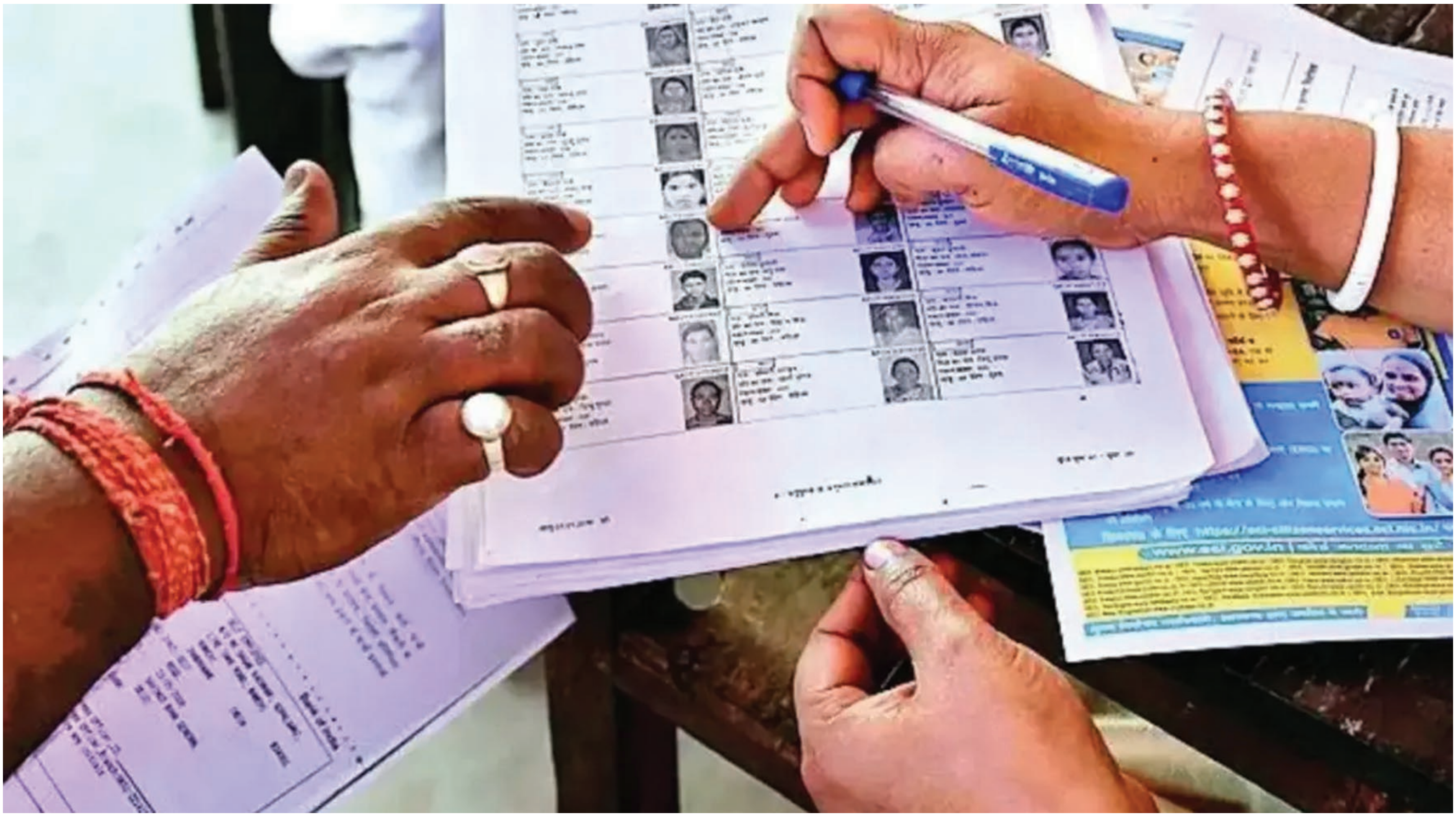

তিনি এও বলেন যে, নির্বাচন কমিশনের লক্ষ্য হলো এমন একটি সিস্টেম তৈরি, যার মাধ্যমে নাগরিকদের অসুবিধায় না ফেলে ইলেক্টোরাল মেশিনারি তৈরি হতে পারে। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের সেই সিদ্ধান্ত থেকেই সৃষ্টি হয় 'বুথ লেভেল অফিসার'-এর পদটি। ঠিক হয় যে, এই নির্বাচনী আধিকারিকরা বুথস্তরে দায়িত্বে থাকবেন এবং ভোটার তালিকা দেখভাল করবেন। তালিকায় নানা সংশোধনের মধ্যে নতুন ভোটারদের নাম সংযোজন, স্থানান্তরিত ভোটারদের নাম বিয়োজন, প্রয়াত ব্যক্তিদের নাম অপসারণ— এই বিষয়গুলিই গুরুত্বপূর্ণ। এক কথায় ভোটার লিস্ট মেন্টেন করার দায়িত্ব এই সরকারি আধিকারিকদের দেওয়া হয়। ২০১০ সালে চালু হওয়া এই কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়— সিস্টেমিক ভোটারস্' এডুকেশন অ্যান্ড ইলেক্টোরাল পার্টিসিপেশন। সরকার বা সাংবিধানিক সংস্থার বিরোধিতার স্বাদ মেটাতে ভারতীয় জনতা পার্টি কিন্তু সেদিন এই কর্মসূচির বিরুদ্ধে পথে নামেনি। সেই সময় এর বিরুদ্ধে সরব হয়নি তৃণমূল কংগ্রেসও। সেদিন কি তবে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ-২ সরকার বা কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন 'ভোট চুরি'র লক্ষ্যেই এই নতুন প্রক্রিয়া শুরু করে? সেদিন যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা লালুপ্রসাদ যাদবদের বিচারে নির্বাচন কমিশন প্রণীত, ভোটার তালিকা সংক্রান্ত এই ব্যবস্থাটি অসহ্য ঠেকত, এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলে যদি সেই যাত্রায় তারা রুখে দিতেন এই কর্মসূচি, তবে আজ হয়তো নিবিড় সংশোধনের ভূত তাড়াতে নির্বাচন কমিশনের অফিসে ওঝার মতো তাদের চড়াও হতে হতো না। বিএলও এবং নিবিড় সংশোধন অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। সুস্থ, স্বাভাবিক নির্বাচনের লক্ষ্যে ভোটার তালিকা সংশোধনী প্রক্রিয়া গণতন্ত্রের ভিত্তিকেই সুদৃঢ় করে। রাহুল গান্ধী নৈশভোজে যতই ভালো-মন্দ মেনু রাখুন, তাতে তো আর লঙ্কার স্বাদ মিষ্টি হবে না। ঠিক তেমনই বিরোধীরা অতি উৎসুক হয়ে ধরনা, পদযাত্রা, কালোপতাকা হাতে নির্বাচন কমিশন ঘেরাও ইত্যাদি করলেও তাতে প্রশাসনকে তার কর্তব্যনীতি থেকে সরে আসতে বাধ্য করা যাবে না। সংসদে বিরোধীদের হইচইয়ের ফলেও কমিশনের সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণিত হয় না। ভোটার তালিকায় এই বিশেষ, নিবিড় সংশোধনের প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় আগামীদিনেও হয়তো কিছু পরিবর্তন আসতে পারে, কিন্তু নিয়মিতভাবে ভোটার তালিকা সংশোধনটা যে জরুরি তা মেনে নেওয়াটাই মনে হয় দেশের সব রাজনৈতিক দলগুলির কাছে বুদ্ধিমানের পরিচয় হবে।

বিহারে নিবিড় সংশোধনে প্রায় ৬৫ লক্ষ নাম বাদ যেতেই নির্বাচন কমিশনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে তামাম বিরোধী পক্ষ। এনিয়ে দেশজুড়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছে বলে কিছু অনুপ্রাণিত সংবাদমাধ্যমেরও দাবি। এই প্রক্রিয়া সাধারণ মানুষের বিরোধী, অগণতান্ত্রিক ইত্যাদি বলে হাজার তর্জা, দৌড়োদৌড়ি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু করেছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। বিষয়টি এখন যদিও আর কংগ্রেস, তৃণমূল, সিপিএম, ডিএমকে, আরজেডি বা আপের আওতায় নেই। ভারতের সর্বোচ্চ আদালতে এটি বর্তমানে বিচারাধীন। বিরোধীদের কাজ রাস্তাঘাটে ফাঁকা উদ্বেগ রটনার। বিহারের কথাই ধরা যাক। ২০০৩ সালে বিহারে ভোটার তালিকায় বিশেষ, নিবিড় সংশোধন হয়। তার ভিত্তিতেই তখন সেই রাজ্যে তৈরি হয়েছিল ভোটার তালিকা। নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে যে, বিহারের ক্ষেত্রে ২০০৩-এর জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত ভোটার তালিকায় যাঁদের নাম ছিল, জীবিত থাকলে তাঁদের নাম এবারও অবশ্যই থাকবে। নিবিড় সমীক্ষার আওতায় আসবে ২০০৩ পরবর্তী এই ২২ বছরের সময়কাল। একইভাবে, পশ্চিমবঙ্গে এই বিশেষ নিবিড় ভোটার সমীক্ষা হয়েছিল ২০০২

সালে। তাই এই বছর এ রাজ্যে ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধনীর কাজ শুরু হলে ২০০২-পরবর্তী সময়কাল সমীক্ষার আওতায় আসবে এটা ধরে নেওয়াই যায়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা রাহুল গান্ধীর ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য ওই '৬৫ লক্ষ' সংখ্যাটাই যথেষ্ট। বিহারের ভোটার তালিকা থেকে বাতিল হওয়া ৬৫ লক্ষের মধ্যে ২১ লক্ষ লোক প্রয়াত। ৩১ লক্ষ লোক অন্যত্র চলে গিয়েছেন, অর্থাৎ স্থানান্তরিত। দেড় লক্ষের মতো ভোটারের ক্ষেত্রে মাল্টিপল্ এন্ট্রির সমস্যা। অর্থাৎ দুই বা একাধিক জায়গায় স্থানীয় ভোটার তালিকায় তাদের নাম বিদ্যমান। এই পরিস্থিতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা রাহুল গান্ধী কী চাইছেন? এই নামগুলি তালিকায় থেকেই যাক? তাতে ভোটের অঙ্কে কার লাভ? এতো সেই 'ঠাকুরঘরে কে, আমি তো কলা খাইনি'-র মতো ব্যাপার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুমকি মাখানো বক্তব্যও ইতিমধ্যে সংবাদমাধ্যমে সম্প্রচারিত হয়েছে। বুথ লেভেল অফিসারদের রীতিমতো শাসিয়ে তাঁদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, 'নির্বাচন কমিশন কিন্তু থাকবে নির্বাচনের সময়টুকুই; তার আগে এবং পরে তো আপনারা রাজ্য সরকারের কর্মচারীই থাকবেন।'

অর্থাৎ তিনি চাইছেন এ রাজ্যের যত ভূতুড়ে ভোটার, অনুপ্রবেশকারী ভোটার সবাই গণতন্ত্রের নামে এই স্বাধীনতার অপব্যবহার করুক। তবেই না তার দুর্নীতিতন্ত্রের ভিত শক্তিশালী ও অটুট থাকবে! কোনো শুভ উদ্যোগকে বিতাড়িত করার কাজে তার সমান্তরাল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কমই রয়েছে। যেমনভাবে, টাটাকে এবং শিল্পে বিনিয়োগের সম্ভাবনাকে এ রাজ্য থেকে তিনি বিতাড়িত করেন, তেমনভাবেই হয়তো ভাবছেন নির্বাচন কমিশনের বিশেষ, নিবিড় সংশোধন বা ভোটার সমীক্ষার প্রক্রিয়াটাকেও তিনি বিতাড়িত করবেন। বিহারের ভোটার তালিকায় সংশোধনীর ক্ষেত্রে ১১টি নথির মধ্যে যেকোনো একটি নথি সংগ্রহের বিষয়টি নির্দিষ্ট করে দেয় নির্বাচন কমিশন। ভোটার তালিকায় কোনো নাম সংযোজন, বিয়োজন ইত্যাদির বিষয়ে বিহারে নির্বাচন কমিশন স্বীকৃত প্রতিটি রাজনৈতিক দল, এমনকী স্থানীয় বাসিন্দাদের যেকোনো মতামত প্রকাশ, বিতর্ক উত্থাপন বা প্রশ্ন রাখার পূর্ণ অধিকারও রয়েছে। কিন্তু দেশের কোনো প্রান্তের ভোটার তালিকায় বিশেষ, নিবিড় সংশোধন করতেই দেবো না, ওটা ভোট চুরির ফন্দি— এহেন উসকানিমূলক মন্তব্য রাজনৈতিক বিরোধ নয়, রাজনৈতিক দুর্গতি-প্রসূত অস্তিত্ব সংকটের আশঙ্কার বহিঃপ্রকাশ। যুক্তিহীনভাবে রাহুল গান্ধীরা বলে চলেছেন যে, তাহলে কি অবৈধ ভোটারে কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হলো? তবে তো সেই নির্বাচনটাই ইনভ্যালিড! তারা হয়তো জানেন না তাদের এই যুক্তিটাই আসলে ইনভ্যালিড। ১৯৫২ সালের আগে সঠিক ও নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরির লক্ষ্যে সর্বাধিক গুরুত্বদান করেন ভারতের প্রথম নির্বাচন কমিশনার সুকুমার সেন। ১৯৫২-র সাধারণ নির্বাচনের পর তিনি নিজেই বলেন— 'too many glitches.'

সেই যুক্তিতে জওহরলাল নেহরুর প্রধানমন্ত্রিত্ব তাহলে ইনভ্যালিড? অন্তরের অন্তঃকরণে ভোট-পূর্ব যাত্রাপালার ইচ্ছে জাগলে রাহুল গান্ধীর মতো বিরোধী নেতারা এমন অনেক আবোলতাবোল বলেন, যা শেষমেশ কোভিড- রাফাল ইত্যাদি বিতর্কের মতো হাসির খোরাক হয়ে ওঠে। শীর্ষ আদালত থেকে একাধিকবার তিরস্কার জুটেছে রাহুল গান্ধী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়দের। তবুও সাগরপারের ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার, এমনকী দেশের সাংবিধানিক সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে তাদের সর্বাত্মক বিরোধে কোনো লাগাম নেই। পাকিস্তান, বাংলাদেশের মতো একই কায়দায় ভারতেও তাদের লক্ষ্য হলো 'রেজিম চেঞ্জ'। নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে ভোটচোর বলছেন রাহুল গান্ধী! একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ রয়েছে— 'চোরের মায়ের বড়ো গলা।' ১৯৮০ সালে নয়াদিল্লিতে সোনিয়া গান্ধীর নাম ভোটার তালিকাভুক্ত হয়। কিন্তু তিনি ভারতীয় নাগরিকত্ব পান ১৯৮৩-তে। ১৯৮০-তে ভোটার তালিকায় সোনিয়া গান্ধীর নামের অন্তর্ভুক্তি অবৈধ। কিংবা তার দেওয়া ভোটটি ইনভ্যালিড। তা নিশ্চিতভাবে নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘন। নির্বাচন কমিশনের দিকেও এক্ষেত্রে অভিযোগের আঙ্গুল উঠতে পারে। মনে রাখতে হবে, নির্বাচন কমিশনের ডানা কিন্তু কংগ্রেস আমলেই ছাঁটা হয়েছিল? বড্ড কড়া ছিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টিএন শেষণ। নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন কঠোর নীতিবান ও দায়িত্বশীল। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসিংহ রাও তড়িঘড়ি শেষণে ভূত দেখলেন। সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে পরিবর্তিত করল কংগ্রেস ও বামপন্থীরা। ১৯৯৩ সালে যুক্ত করা হয় আরও দুই নির্বাচন কমিশনার— এমএস গিল এবং জিভিজি কৃষ্ণমূর্তিকে। নির্বাচন কমিশনের ক্ষেত্রে সরাসরি হস্তক্ষেপ করলেও সেদিন কেউ কিন্তু এই ধরনের কংগ্রেসি ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে কোনো প্রশ্ন করেননি। মামলা দায়ের হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। যদিও আইনের দৃষ্টিতে নরসিংহ রাও ভুল প্রমাণিত হননি। আইনত ভুল হয়তো সে যাত্রায় প্রমাণিত হয়নি কংগ্রেস। কিন্তু এটা প্রমাণিত হয়েছিল যে নির্বাচন কমিশনের সাহসী পদক্ষেপ বা কমিশনের সক্রিয়তায় বিচলিত হয় কংগ্রেস। সেই ট্র্যাডিশন আজও চলছে। নির্বাচন কমিশনের কাজ হলো— 'অ্যাক্ট অফ ফেইথ'। সংবিধানের কাছে দায়বদ্ধ নির্বাচন কমিশন। বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলের 'স্যাটিসফ্যাকশন' তার দায়িত্ব নয়। কমিশনের কাজের বিরোধিতার মধ্যে যদি কোনো সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ থাকে, যদি সাধারণ মানুষের কানে কমিশনের বিরুদ্ধে মন্ত্র দেওয়ার কাজ চলতে থাকে, তবে অচিরেই দেশের গণতন্ত্রের দুর্দিন উপস্থিত হতে পারে। দেশের গণতন্ত্রকে মজবুত করাই নির্বাচন কমিশনের লক্ষ্য। সেই প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করার পরিবর্তে যদি দৃষ্টি ঘোরাতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিরোধিতা চলে, তবে তা বেশি সময় স্থায়ী হয় না। ভোটার তালিকায় বিশেষ, নিবিড় সংশোধনের লক্ষ্যে ঠিক পথেই এগোচ্ছে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন। আর তাই ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে ইন্ডিজোট। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের পর সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছিল এই জোট। এর অস্তিত্বের কথা ভুলতে বসেছিল সবাই। এখন নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমে এরা নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেওয়ার চেষ্টা করছে। হয়তো পরিকল্পনা রয়েছে এই ইস্যুতে দেশজুড়ে বড়ো কোনো গোলমাল পাকানোর। বিভিন্ন রাজ্যে এই জোটের শরিক দলগুলি পরস্পরের রাজনৈতিক শত্রুও বটে। জাল ভোটার-মুক্ত তালিকা তৈরিতে এরা সিঁদুরে মেঘ দেখছে। আগামীদিনে রাজনৈতিক অস্তিত্ব সংকটের আশঙ্কায় নিজেদের একটি ঐক্যবদ্ধ রূপ তুলে ধরার কুনাট্যে মত্ত ইন্ডিজোটের শরিক দলগুলি। ■

মালদহ শহরে সহস্রকণ্ঠে গীতাপাঠ

সনাতন সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে গত ২৪ আগস্ট মালদা শহরের সিঙ্গাতল টাউন স্কুল মাঠে সহস্রকণ্ঠে গীতাপাঠের আয়োজন করা হয়। বিশালাকার মণ্ডপে দূরদূরান্ত থেকে আগত ভক্তরা গীতাপাঠের জন্য সমবেত হন। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সনাতন সংস্কৃতি সংসদের প্রধান উপদেষ্টা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ট্রাস্টি স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ। উপস্থিত ছিলেন রিষড়া প্রেম মন্দির আশ্রমের সচিব শ্রীমৎ নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারী, প্রভু জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ মঠের সচিব শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী, শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সঙ্ঘের যুগ্ম সম্পাদক শ্রীমৎ জগদার্তিহা দাস।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভেই 'হে পার্থসারথি বাজাও বাজাও তোমার পাঞ্চজন্য শঙ্খ' গানটি গাওয়া হয়। এরপর উপস্থিত সকলের হাতে গীতা তুলে দেওয়া হয়। গীতাপাঠ পরিচালনা করেন শ্রীমৎ নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী এবং শ্রীমৎ জগদার্তিহা দাস। গীতা পাঠান্তে আশীর্বচন দান করেন মালদহ রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী দ্বিজেন্দ্রানন্দ মহারাজ। তারপরেই গীতাপাঠের প্রয়োজনীয়তা এবং জাতিগঠনের বিষয়ে মনোগ্রাহী ভাষণ রাখেন স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীমৎ জগদার্তিহা দাস প্রভু। অনুষ্ঠান শেষে সকলের হাতে প্রসাদ তুলে দেওয়া হয়।

সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গের উদ্যোগে জন্মাষ্টমী উদ্‌যাপন

গত ১৬ আগস্ট শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে সংস্কার ভারতীর পক্ষ থেকে রাজ্যজুড়ে 'শ্রীকৃষ্ণ সাজো' রূপসজ্জার আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি আয়োজন করা হয় কীর্তন, গানের আসর, ভক্তিগীতি, নৃত্য, গীতিআলেখ্য-সহ সাংস্কৃতিক চর্চা। বীরভূম, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, পূর্ব বর্ধমান, হুগলী, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলার এই এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এদিন হাজার হাজার শিশু রাজ্যজুড় মঞ্চ মাতিয়েছে।

বীরভূমের সিউড়ী সরোজিনী দেবী সরস্বতী শিশুমন্দির প্রাঙ্গণ, গোবরডাঙ্গা পৌর টাউন হল, চড়কতলার কলাজ্যোতি গুরুকুল, কলকাতার মানিকতলা চর্চাকেন্দ্র, দেশবন্ধুনগর চর্চাকেন্দ্র, নবদ্বীপের সারদা শিশুতীর্থ প্রভৃতি জায়গায় প্রতিবছরের মতো শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীকে সামনে রেখে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে মায়েরা তাদের শিশুদের শ্রীকৃষ্ণ সাজিয়ে তাঁদের শিশুদের শামিল করেছেন।

বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের উদ্যোগে সপ্তশক্তি সঙ্গমের মাতৃকর্মশালা

বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদ, দক্ষিণবঙ্গের উদ্যোগে গত ২৩-২৪ আগস্ট বর্ধমানের ইছলাবাদ ক্ষুদিরামপল্লীর সারদা শিশুমন্দিরে সপ্তশক্তি সঙ্গমের প্রান্তীয় মাতৃকর্মশালার আয়োজন করা হয়। দক্ষিণবঙ্গের ১২টি জেলা থেকে ৬৯ জন মাতা-ভগ্নী কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। মাতৃকর্মশালায় বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যা ভারতী অখিল ভারতীয় শিক্ষা সংস্থানের সহ-সম্পাদিকা পবিত্রা দাহাল। তিনি বলেন, বিদ্যা ভারতীর যোজনানুসারে 'সপ্তশক্তি' নামে মাতৃজাগরণের উদ্দেশ্যে সারা দেশে ২৫ হাজার মাতৃসম্মেলনের আয়োজন করা হবে। দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তে এরকম ৪০০টি মাতৃকর্মশালার আয়োজন করা হবে এবং তা আগামী ৫ অক্টোবর রানি দুর্গাবতীর জন্মদিন থেকে শুরু করে ২৩ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত চলবে। তিনি বলেন, আমাদের ঘরে ঘরে স্ব-ভাষা, স্ব-বসনের প্রতি জোর দিতে হবে, যার দ্বারা স্ব-এর প্রতি স্বাভিমান জাগ্রত হয়। কর্মশালায় উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন বিদ্যা ভারতীর পূর্বক্ষেত্র সভাপতি গোপাল চন্দ্র হালদার, সংগঠন সম্পাদক পার্থ ঘোষ এবং প্রবাসী কার্যকর্তা, ঝাড়গ্রাম ও মেদিনীপুর জেলা সংযোজক দেবাংশু কুমার পতি।

কর্মশালায় উপস্থিত মাতৃমণ্ডলীকে 'সপ্তশক্তি' জাগরণের জন্য 'সংকল্প পাঠ' করানো হয়। সংকল্প পাঠ করান শ্রীমতী কুমকুম চক্রবর্তী। গোপাল চন্দ্র হালদারের প্রেরণাদায়ী বক্তব্যের পর শান্তিমন্ত্রের মাধ্যমে কর্মশালার সমাপ্তি হয়। সমগ্র কার্যক্রম পরিচালনা করেন কাশিমবাজার লাধুরাম তোষণীওয়াল সরস্বতী শিশু মন্দিরের প্রাতঃবিভাগের আচার্য প্রমুখ শ্রীমতী পলভা গোস্বামী।

বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের উদ্যোগে গণিত ও বিজ্ঞান মেলা

বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদ দক্ষিণবঙ্গের উদ্যোগে গত ২২-২৩ আগস্ট হাওড়া জেলার তাঁতিবেড়িয়া সারদা শিশুমন্দিরে গণিত ও বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা হয়। দক্ষিণবঙ্গের ৪৩টি শিশুমন্দির ও বিদ্যামন্দিরের জেলাস্তরে উত্তীর্ণ ১০০জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে এই মেলায়। মেলায় বিজ্ঞান প্রদর্শন, বিজ্ঞান প্রশ্নমঞ্চ, গণিত প্রয়োগ, বৈদিক গণিত মডেল, বৈদিক প্রশ্নমঞ্চ ইত্যাদি বিষয়ে প্রদর্শন হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের ৪টি ভাবে যেমন শিশু বর্গ, বালক বর্গ, কিশোর বর্গ ও তরুণ বর্গে বিভাজন করে এই কর্মশালা চলে। মেলার উদ্দেশ্য ছিল, বিজ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা জাগানো এবং বিজ্ঞানের প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ বৃদ্ধি করা। বিদ্যাবিকাশ পরিষদের অধিকাংশ আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন এই কর্মশালায়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ৬৬ জন শিক্ষক, অধ্যাপক বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

প্রায় ৪০০ জনের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা সুচারুরূপে পরিচালনা করে তাঁতিবেড়িয়া সারদা শিশু ও বিদ্যা মন্দিরের আচার্য-আচার্য এবং সেবিকাবৃন্দ।

জয়নগর শিবালয় মন্দিরে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

কলকাতা শহর থেকে দূরে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে নানা প্রতিকূলতাকে জয় করে

একজন তরুণ সন্ন্যাসী নীরবে করে চলেছেন মনুষ্যত্বের সাধনা। গত ১৫ আগস্ট,স্বাধীনতা দিবসে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলায় জয়নগর ঘোষের চকের ভূমিপুত্র তরুণ সন্ন্যাসী রাজমোহন বৈরাগী স্থানীয় শিবালয় মন্দিরে প্রায় ১০০ জন শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এদিন এই স্থানে ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরগতিপ্রাপ্ত বিপ্লবী এবং বরেণ্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের অনুষ্ঠানও হয়। শুধুমাত্র ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে নয়, সারা বছর ব্যাপী এই শিবালয় মন্দিরে মনীষী ও বিপ্লবীদের জন্মদিন উদ্‌যাপিত হয়। তাঁদের প্রয়াণ দিবসেও তাঁদের আদর্শ, আত্মত্যাগ ও অবদান স্মরণ করা হয়। তাঁদের স্মৃতিচারণ-সহ তাঁদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। গত ১৫ আগস্ট আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন)-এর প্রপৌত্র ইন্দুজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরগতিপ্রাপ্ত বিপ্লবী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের প্রপৌত্র অধীশ ভট্টাচার্য্য, বিপ্লবী পরীক্ষিৎ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রবধূ মঞ্জু মুখোপাধ্যায়, বিপ্লবী নিরঞ্জন চক্রবর্তীর কন্যা দীপশিখা চৌধুরী, বিপ্লবী দেবেন্দ্রনাথ ঘোষের দুই প্রপৌত্রী মিতালী সরকার ও রমা সরকার, বিপ্লবী তারকেশ্বর সেনগুপ্তর পুত্র পরিমল সেনগুপ্ত এবং বিপ্লবী কালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর প্রপৌত্রী কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও, নানা উপহার সামগ্রী নিয়ে সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত সমাজসেবী এবং অন্যান্য সম্মানিত অতিথিরা কলকাতার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এদিন অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত হয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের হাতে এদিন খাতা, বই, কলম ইত্যাদি সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। অধুনা বিশ্বায়নের যুগে ভোগসর্বস্ব জীবনযাত্রায় একদিকে দাঁড়িয়ে শহুরে মানবসমাজ। এর বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে এই তরুণ সন্ন্যাসী মানবিক পৃথিবী নির্মাণের লক্ষ্যে অবিচল থেকে,ত্যাগব্রতের সংকল্পে শামিল হয়েছেন ভারতের জাতীয় স্বপ্নপূরণের অভিযাত্রায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল বিশিষ্টজন তাঁর এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানান।

কলকাতা সেন্ট্রাল পার্কে প্রকৃতি বন্দন অনুষ্ঠান

গত ২৪ আগস্ট কলকাতা সেন্ট্রাল পার্কে পরিবেশ সংরক্ষণ গতিবিধির উদ্যোগে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে প্রকৃতি বন্দন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন সকাল ৯টায় শ্রীমতী বীণা জয়সোয়ালের নেতৃত্বে শান্তিমন্ত্রপাঠ এবং 'দেশ হমে দেতা হ্যায় সব কুছ' সমবেত গানের অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। স্বাগত ভাষণ রাখেন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সহ-সংযোজক অজয় পাত্র। পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে ভাষণ রাখেন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সংযোজক মানস ঘোষ। শ্রীমতী অর্চনা আগরওয়াল অরণ্যরক্ষার জন্য অমৃতা বেদীর বলিদানের কাহিনি বর্ণনা করেন। শ্রীমতী যোগিনী বাপট দৈনন্দিন জীবনে পরিবেশ-বান্ধব অভ্যাস গ্রহণের আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের মধ্যেই শ্রীমতী বাপট প্রশ্নোত্তরীর আয়োজন করেন এবং বিজয়ী দলকে পুরস্কারস্বরূপ বায়োএনজাইম প্রদান করেন। দুপুর ১২টায় সমাপন সত্রে সমবেত কণ্ঠে 'ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' গানটি গাওয়া হয়। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকলের মধ্যে পরিবেশ সংরক্ষণে এক নতুন সংকল্প ও প্রেরণার সঞ্চার করে।

হারানো পত্রিকা—দুই

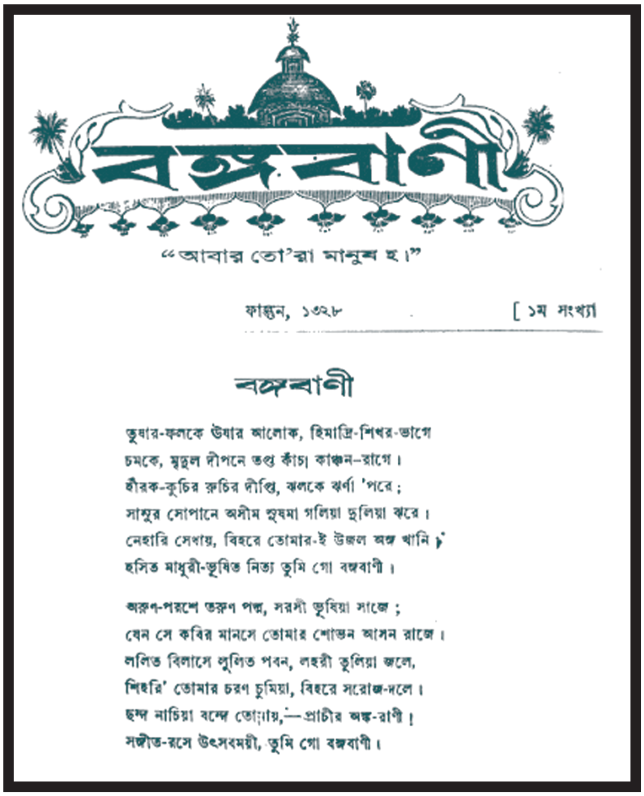

বঙ্গবাণী

"আবার তো'রা মানুষ হ।"

ফাল্গুন, ১৩২৮ [১ম সংখ্যা

বঙ্গবাণী

তুষার-ফলকে ঊষার আলোক, হিমাদ্রি-শিখর-ভাগে
চমকে, মৃদুল দীপনে তপ্ত কাঁচা কাঞ্চন-রাগে।
হীরক-কুচির রুচির দীপ্তি, ঝলকে ঝর্ণা 'পরে;
সানুর সোপানে অসীম সুষমা গলিয়া দুলিয়া ঝরে।
নেহারি সেথায়, বিহরে তোমার-ই উজল অঙ্গ খানি;
হসিত মাধুরী-ভূষিত নিত্য তুমি গো বঙ্গবাণী।

অরুণ-পরশে তরুণ পদ্ম, সরসী ভূষিয়া সাজে;
যেন সে কবির মানসে তোমার শোভন আসন রাজে।
ললিত বিলাসে দুলিত পবন, লহরী তুলিয়া জলে,
শিহরি' তোমার চরণ চুমিয়া, বিহরে সরোজ-দলে।
ছন্দ নাচিয়া বন্দে তোমায়,—প্রাচীর অঙ্ক-রাণী।
সঙ্গীত-রসে উৎসবময়ী, তুমি গো বঙ্গবাণী।

বাংলা সাহিত্যের খনি

বঙ্গবাণী

নন্দলাল ভট্টাচার্য

সেটা ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের কথা। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্স নিয়ে বিএ পাশ করলেন প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে। স্বাভাবিক ভাবে ইংরেজি নিয়ে এমএ পড়ার কথা। কিন্তু বাবা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কথায় সদ্য প্রবর্তিত বাংলা তথা ভারতীয় ভাষা পাঠক্রমে ভর্তি হলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

শ্যামাপ্রসাদের দাদা রমাপ্রসাদ সে সময় প্রথম শ্রেণীতে ইংরেজিতে এমএ এবং আইন পাশ করে কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করছেন। তা এক ছুটির দিনে চলছিল দু' ভাইয়ের কথাবার্তা। চলছিল নানা বিষয়ে আলোচনা। তারই মধ্যে রমাপ্রসাদ বলেন, আমাদের বাড়ি থেকে একটা বাংলাসাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করলে কেমন হয়!

কথাটা প্রায় লুফে নিলেন শ্যামাপ্রসাদ। বলেন, খুব ভালো হয়। একটা কাজের মতো কাজ হবে। শুরু হলো দু' ভাইয়ের আলোচনা। কেমন হবে নতুন পত্রিকা। তার নাম আর চরিত্র কী হবে তা নিয়ে অনেক কথা। এবার তাঁরা যান বাবার কাছে। জানতে চাইলেন তাঁর মতামত।

আশুতোষও কিছুদিন ধরেই ভাবছিলেন এমন একটা কথা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে বাংলা পাঠক্রম প্রবর্তন করার পর থেকেই তার পরিকাঠামো তৈরির জন্য অন্যান্যদের সঙ্গে দীনেশ সেনকে দিয়েছেন বিশেষ দায়িত্ব। এখন ছেলেদের কথায় মনে হলো সত্যিই এমন একটা পত্রিকা প্রকাশ করতে পারলে সেটা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার সুবিধে হবে। তাই সানন্দেই মত দিলেন তিনি। সেইসঙ্গে সে পত্রিকা সম্পর্কে দিতে থাকেন নানা পরামর্শ।

অবশেষে ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে, ইংরেজি ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মার্চে আত্মপ্রকাশ করল আশুতোষ-রমাপ্রসাদ- শ্যামাপ্রসাদ— এই ত্রিবেণী সঙ্গম-সম্ভব 'বঙ্গবাণী'। পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক হলেন ড. দীনেশ চন্দ্র সেন এবং বিজয়চন্দ্র মজুমদার। রমাপ্রসাদ হলেন পত্রিকার পরিচালক। আর্থিক দায়দায়িত্বও নিলেন তিনিই। ৭৭নং আশুতোষ মুখার্জি রোড (তৎকালীন রসগ রোড) ভবানীপুরে ছিল পত্রিকাটির কার্যালয়। পত্রিকাটির প্রতি সংখ্যার দাম ছিল সাত আনা, বার্ষিক চার টাকা বারো আনা।

পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্যর কথা স্পষ্ট ভাবেই বলা হলো সম্পাদকীয়তে। বলা হলো— "নূতন যুগ আসিয়াছে; দেশে নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনার যুগে অনেক নূতন বিপদ আসিয়া উন্নতির বাধা হইয়া দাঁড়ায়। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় সেই বিপদ এড়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সুবুদ্ধির পরিচালনা না থাকিলে হিতৈষণার মোহ কেবল অন্ধকার সৃষ্টি করে, উচ্ছৃঙ্খল উৎসাহ সমাজে আত্মদ্রোহ ও আত্মহত্যা টানিয়া আনে। যাহারা কর্মের নামে ব্যগ্র ও চঞ্চল, তাহারা চিন্তাশীলদিগকে অকর্মা বলিয়া উপেক্ষা করিবেই, কিন্তু উৎসাহপীড়িত কর্মীদলের নায়কদিগকে পরোক্ষভাবে নিয়মিত করিবার জন্য চিন্তাশীলদিগের অভিজ্ঞতার বাণী নিরন্তর প্রচার করিবার প্রয়োজন। আমরা এদিনে হিতৈষী মন্ত্র-দ্রষ্টাদের মন্ত্রণা ভিক্ষা করিতেছি।"

'বঙ্গবাণী' তার আবির্ভাব মুহূর্ত থেকেই নতুন যুগের পদধ্বনি শুনতে পেয়েছিল। নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনার অনুভব ছিল তার অন্তরে। কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল এক ধরনের সংযম। সে সংযমের শিল্প, অতি উৎসাহ ও উদ্দীপনা অনেকটা একচক্ষু হরিণের মতো। বিপদ যে কোনদিকে সে সম্পর্কে সচেতনতা বা দিশা কোনোটাই তার থাকে না। তাই উৎসাহী হয়েও হতে হয় সচেতনতার ঘোড়সওয়ার।

'বঙ্গবাণী'র এই জাতীয় উপলব্ধির মূলে রয়েছে বিশ শতকের সেই সময়কালের বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতির অতি মেরুকরণ। রবীন্দ্রনাথ তখন বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। তাঁকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে সাহিত্যসৃজনে ব্যাপৃত নক্ষত্রপুঞ্জ। কিন্তু সেখানে দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী

দুই আবর্তন। একদল অতি আনুগত্যে রবীন্দ্র অনুসৃত শৈলীতে রূপমুগ্ধ এবং তাকেই চরম সত্য বলে অন্য সবকিছু সম্পর্কে বিমুখ। তাই-বা কেন, বিপরীত ধারার সবকিছুর প্রতিই দুর্বাসাসম দুর্মুখ এবং খড়্গহস্ত।

অন্যদিকে, আরেকজন তরুণ সচেতনভাবেই রবীন্দ্রবিরোধী। কেবল তাঁর সাহিত্যরীতি নয়, তাঁর সবকিছুকে অস্বীকার করাটাকেই একমাত্র জীবন দর্শন হিসেবে মান্যতা দিতে সদা রণংদেহি। অবশ্য এই রবীন্দ্র বিরোধীদের আর একটি অংশ রবীন্দ্রনাথকে স্বীকার করেও তাঁর সাহিত্য দর্শনের বিপরীতে দাঁড়িয়ে সাহিত্যে নবীনতার উদ্বোধনে উন্মুখ।

বাংলাসাহিত্য সৃজনের সেই সন্ধিলগ্নে সকলেই তখন হাঁটছিলেন এক ধরনের অতি-আনুগত্য এবং অন্ধ গোঁড়ামির উপচক্ষু পরে। ফলে আর যাইহোক, এই 'অতি'-র কোনো ধারাই ছিল না পক্ষপাতশূন্য। তারই মধ্যে নিরপেক্ষতার পথ ধরল 'বঙ্গবাণী'। রবীন্দ্রনাথ ও নবীন প্রগতিপন্থী সকলকে নিয়েই চলা শুরু করল ওই নতুন পত্রিকা, তাঁদের বিশ্বাসে বাংলা সাহিত্যের সার্বিক স্বার্থেই। আর ঠিক ওই কারণেই রবীন্দ্রকেন্দ্রিক প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজ পত্র' অথবা রবীন্দ্রবর্জিত চিত্তরঞ্জনের 'নারায়ণ' পত্রিকার মতো কোনো নিজস্ব লেখক গোষ্ঠী তৈরি না করে 'বঙ্গবাণী' সকলকে সঙ্গে নিয়ে পথ চলা শুরু করে। এক্ষেত্রে 'কল্লোল' গোষ্ঠীর অতি বাস্তববাদীদের হাত ধরেছিল 'বঙ্গবাণী'। এবং সকলের জন্য, সকলকে সঙ্গে নিয়েই 'বঙ্গবাণী' বাংলা সাহিত্য পত্রিকার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট ধারার প্রবর্তন করে।

প্রথম থেকেই এক বিশেষ শৈলীর অনুসারী হয় 'বঙ্গবাণী'। প্রতি সংখ্যার সূচনা-পৃষ্ঠার মাথায় থাকত একটি মন্দিরের রেখাচিত্র। ঠিক তার নীচেই থাকত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতার একটি বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি— 'আবার তোরা মানুষ হ'। বস্তুত ওটাই ছিল পত্রিকাটির অভীমন্ত্র।

'বঙ্গবাণী'-র প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকীয়র পরই ছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'বাণী বিনিময়'— রবীন্দ্র হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি-সহ। ছিল অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধ 'শিল্পে

বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের সময় বলেছিলেন, 'কালস্রোতে এসকল জলবুদ্বুদ মাত্র। এ সংসারে জলবুদ্বুদও নিষ্কারণ বা নিশ্চল নহে'। কথাটা সমস্ত পত্রপত্রিকার ক্ষেত্রেই সমান সত্য। সে কারণেই ক্ষণজীবী হওয়া সত্ত্বেও 'বঙ্গবাণী' তার সমকালে হয়ে উঠেছিল বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির যথার্থ মুখপত্র।

অনধিকার', হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এবং অনুরূপা দেবীর ধারাবাহিক উপন্যাস যথাক্রমে 'অপরাজিতা' এবং 'হারানো খাতা', সুনীতি দেবীর গল্প 'পাষাণী', অক্ষয় সরকার, দীনেশ চন্দ্র সেন, সুরেন্দ্রনাথ সেন, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের প্রবন্ধ; কালিদাস রায়, সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়ের কবিতা, রোগশয্যা থেকে বিপিনচন্দ্র পালের বক্তব্য ইত্যাদি। ছিল কয়েকটি নিয়মিত বিভাগ, কার্টুন, অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি। ১০২ পৃষ্ঠার প্রথম সংখ্যাটিতে ছিল উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিজ্ঞাপন। প্রথম সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ ছিল গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্রাবলি।

বিষয় বৈচিত্র্য, খ্যাতিমান লেখকদের উচ্চমানের রচনা, অঙ্গসজ্জা, ছবি ও কার্টুনের ব্যবহার, সরস রম্যরচনা, বেশকিছু আকর্ষক নিয়মিত বিভাগ— আবির্ভাব লগ্ন থেকেই 'বঙ্গবাণী'-কে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তোলে। দুই মলাটের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের রচনার সুপরিকল্পিত বিন্যাস ও পরিবেশন রীতি 'বঙ্গবাণী'-কে বাংলা পত্রপত্রিকার ইতিহাসে একটা আলাদা গৌরবজনক আসনে বসার অধিকার দেয়। পত্রিকাটি প্রথম দিকে ছাপা হতো ৫৭নং, হ্যারিসন রোডের (বর্তমান মহাত্মা গান্ধী রোড) কটন প্রেস থেকে। পত্রিকার প্রথম মুদ্রক ও প্রকাশন ছিলেন জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ। তৃতীয় বছরের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে পত্রিকাটির মুদ্রক ও প্রকাশক হন যথাক্রমে সত্যকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় এবং কিশোরী মোহন ভট্টাচার্য। পত্রিকাটির ষষ্ঠবর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে এটি ছাপা হয় লিথো অ্যান্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে।

'বঙ্গবাণী' প্রকাশের উদ্যোগ মুহূর্তগুলির কথা জানা যায় আশুতোষের ছোটোছেলে উমাপ্রসাদের বয়ানে। তাঁর কথায়, 'আমার বড় দাদা ও মেজদাদা--- রমাপ্রসাদ ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে ও প্রযত্নে আমাদের বাড়ি থেকে ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রিকার প্রকাশ শুরু হয়। পিতৃদেব তখন বর্তমান। হাইকোর্টে বিচারপতির আসনে আসীন। এ প্রচেষ্টায় তাঁরও সক্রিয় সহানুভূতি থাকে। প্রথম দিকে যুগ্ম সম্পাদক থাকেন— ড. দীনেশচন্দ্র সেন ও বিজয়চন্দ্র মজুমদার। পরে একা বিজয়বাবুই সম্পাদক থাকেন। আমিও আমার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে একাজে মেতে উঠি।' (পথের দাবি প্রকাশন প্রসঙ্গে (মিত্র ও ঘোষ), পৃ. ৪৩২)।

'বঙ্গবাণী' প্রকাশিত হয়েছিল আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পূর্ণ সমর্থনে। কিন্তু সেসময় তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাজে। একই সঙ্গে তখনও রয়েছেন বিচারপতি পদে। ফলে তাঁর ওপর ছিল কাজের অসম্ভব চাপ। অন্যদিকে নজর দেওয়ার মতো সময় তাঁর হাতে প্রায় ছিলই না। সে কারণে এই পত্রিকার কাজকর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে তিনি তেমন কিছু করতে পারেননি। তবে নিজের অজস্র কাজের মধ্যেও পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দীনেশচন্দ্র সেন এবং বিজয় মজুমদারের নিয়োগে তাঁর প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল বলেই অনুমান করা যায়।

পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকেই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পবিষয়ক ধারাবাহিক প্রবন্ধের প্রকাশের ব্যবস্থা তিনি করে দেন এমন মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তিনিই অবনীন্দ্রনাথকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণীশ্বরী অধ্যাপক পদে মনোনীত

করেছিলেন। সেই বক্তৃতামালার ২৭টি বক্তৃতাই বঙ্গবাণী'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যা থেকেই রবীন্দ্রনাথকে পত্রিকাটিতে যুক্ত করার ক্ষেত্রেও তাঁর ছিল অনুঘটকের ভূমিকা এমন ধারণা অসঙ্গত নয়। ১৩৩১ বঙ্গাব্দের কার্তিক থেকে বেশ কয়েক সংখ্যায় প্রকাশিত হয় আশুতোষের চিঠিপত্রও। সম্ভবত একটি গল্পও লেখেন তিনি এই পত্রিকায়।

পত্রিকাটির দ্বিতীয় বছরের শেষে প্রকাশিত হয় 'দীনেশবাবুর-পত্র' শিরোনামে একটি বিজ্ঞপ্তি— 'বঙ্গবাণীর দ্বিতীয় বর্ষ উত্তীর্ণ হইল। নানা কারণে আমি সম্পাদক রূপে পত্রিকার কার্য্যে বিশেষ কোনো সহায়তা করিতে পারি নাই। অনেক সময়ই আমি রোগের শয্যায় পড়িয়াছিলাম, সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও কার্য্য করিবার শক্তি ছিল না। এখনো আমার শরীর শোধরায় নাই, বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়ে গুরুতর কর্তব্য ভার কাঁধে বহন করিয়া বঙ্গবাণীর সেবায় ঈপ্সিত পরিমাণ মনোযোগ ভবিষ্যতে দিতে পারিব, ইহার কোনো সম্ভাবনাই দেখিতে পাইতেছি না। সুতরাং বৃথা সম্পাদকীয় পদের সম্মানের প্রতি লোভ রাখা আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি না।' সম্পাদনা ছাড়লেও দীনেশ সেন কিন্তু নিয়মিতই লেখা দিতেন এ পত্রিকায়।

দীনেশ সেন সরে আসার পর বিজয়চন্দ্র মজুমদার একাই সব দায়িত্ব সামলান। আইনজ্ঞ বিজয়বাবু ছিলেন কবি, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক এবং বহু ভাষাবিদ। কাব্যপ্রীতির কারণেই 'বঙ্গবাণী'-তে তিনি কবিতার জন্য একটু বেশি জায়গাই রাখেন। সেকালের প্রায় সব কটির লেখাই ছাপা হয় 'বঙ্গবাণী'-তে। এটা কম শ্লাঘার ব্যাপার নয়।

'বঙ্গবাণী'-র ঘোষিত নীতি— '...প্রতিজ্ঞা ছিল এই পত্রিকাকে কোনো দল বিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের মুখপত্র করিব নাই। সকল শ্রেণীর চিন্তাশীল সুলেখকদিগকে স্বাধীনভাবে তাঁদের বিভিন্ন মতবাদ প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিব।' তাই বলা হয়— '...কোন সম্প্রদায় বা দলবিশেষের আধিপত্য বাড়াইয়া সাহিত্যকে সংকীর্ণ করা হইবে নাই। এই পত্রিকায় চিত্ত বিনোদনের উপকরণের সঙ্গে গুরুতর চিন্তার বিষয়গুলিও থাকিবে।' এসব যে নিছক কাগুজে ঘোষণা নয়, তার নজির রয়েছে পত্রিকাটির লেখক নির্বাচনে। রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর অনুগামীরা যেমন ছিলেন এই পত্রিকার লেখক, তেমন একই গুরুত্বে ছাপা হয়েছে 'কল্লোল'-এর দুই সম্পাদক দীনেশ রঞ্জন দাশ ও গোকুল চন্দ্র নাগ এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় অথবা রবীন্দ্র বিরোধী ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তর লেখাও।

১৩২৮-এর ফাল্গুন থেকে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের মাঘ, মাত্র ছ'বছর এই পত্রিকার জীবনকাল। এই সময়কালে 'বঙ্গবাণী' হয়ে ওঠে 'প্রবাসী', 'সুবজ পত্র' এবং 'কল্লোল'-এর দুই ভিন্ন মেরুর পত্রপত্রিকার যুগের এক গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র। কেবল সাহিত্য আলোচনা নয়,সমকালের দেশ বিদেশের নানা ঘটনা প্রবাহ, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান-শিল্প-সংস্কৃতি, সংগীত, কৃষি প্রযুক্তি ইত্যাদি সব কিছুই ছিল এই পত্রিকার উপজীব্য। বস্তুত, জ্ঞানচর্চার আদিগন্ত প্রেক্ষাপটে বিম্বিত ছিল এই পত্রিকার পৃষ্ঠাগুলি। বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সমাজ-সংস্কৃতির সামগ্রিক উন্নয়ন ছিল পত্রিকাটির উদ্দেশ্য। আর সে কারণেই সমস্ত গোষ্ঠীর বন্ধনকে অস্বীকার করে সমকালীন প্রতিষ্ঠিত এবং প্রতিশ্রুতিমান সকলের লেখাকেই প্রকাশ করেছে সমান মর্যাদায়।

'বঙ্গবাণী'-র প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই থেকেছে রবীন্দ্রনাথের কোনো না কোনো লেখা— গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ অথবা চিঠিপত্র। প্রকাশিত হয়েছে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ। দেশবন্ধু, বিপিনচন্দ্র পাল, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বনফুল, নিরুপমা দেবী, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, নরেশ সেনগুপ্ত, বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, মনীশ ঘটক, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের গল্প, উপন্যাস। কবিতা লিখেছেন নজরুল, জীবনানন্দ, কালিদাস রায়, কুমুদ রঞ্জন মল্লিক, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কামিনী রায়, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, বন্দে মিয়া, গোলাম মোস্তাফা, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কবি গুণাকর, সজনীকান্ত দাস প্রমুখ। প্রবন্ধকারদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিনয় সরকার, জ্যোতির্ময়ী দেবী, মহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং অবশ্যই দুই সম্পাদক।

সমস্ত দিক থেকেই সেই সময়কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পত্রিকা 'বঙ্গবাণী'। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের সময় বলেছিলেন, 'কালস্রোতে এসকল জলবুদ্বুদ মাত্র। এ সংসারে জলবুদ্বুদও নিষ্কারণ বা নিশ্চল নহে'। কথাটা সমস্ত পত্রপত্রিকার ক্ষেত্রেই সমান সত্য। সে কারণেই ক্ষণজীবী হওয়া সত্ত্বেও 'বঙ্গবাণী' তার সমকালে হয়ে উঠেছিল বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির যথার্থ মুখপত্র। আর তাই পূর্ব ঘোষণা মতো ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ বা ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে 'বঙ্গবাণী' বাংলার সাহিত্য মঞ্চ থেকে বিদায় নিলেও ইতিহাসে আজও তার গুরুত্ব সূর্য-সম। □

রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বিজয় চন্দ্র মজুমদার

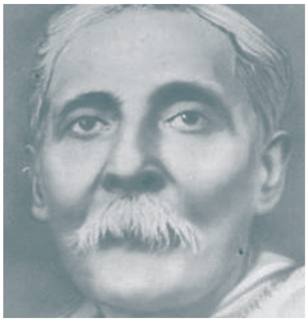

দীনেশ চন্দ্র সেন

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের প্রাচীন ও যোগভিত্তিক সাধনপন্থা

অপু সাহা

এটি শুধু একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় নয়, বরং এক গভীর আধ্যাত্মিক ধারা, যেখানে তন্ত্র, যোগ, দেহতত্ত্ব, শক্তিসাধনা ও গুরুপরম্পরা মিলিত হয়ে এক অনন্য জীবনদর্শন গড়ে তুলেছে। নাথ সম্প্রদায় মূলত যোগসাধক, যাঁরা আত্মজ্ঞান এবং চূড়ান্ত মুক্তির সাধনায় ব্রতী। 'নাথ' শব্দের অর্থ প্রভু স্বামী বা গুরু। নাথ সম্প্রদায়ের মূল কথা হলো— নিজেকে শুদ্ধ করে শিবতত্ত্বে বিলীন হওয়া। এই সম্প্রদায়ের মূল ভিত্তি হলো : যোগ সাধনা, কুণ্ডলিনী জাগরণ, শক্তি ও চক্রতত্ত্ব, আত্মজ্ঞান ও মুক্তি।

নাথ সম্প্রদায়ের সূচনা হিন্দুধর্মের শৈব ও তান্ত্রিক ধারার মিলনবিন্দু থেকে। নাথ সম্প্রদায়ের উত্থান সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া না গেলেও বিশেষজ্ঞদের ধারণা নাথ সম্প্রদায়ের বিকাশ অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীতে। এই সম্প্রদায়ের মূল প্রবর্তক হিসেবে ধরা হয় দেবাদিদেব শিবকে, যিনি 'আদি যোগী' বা 'আদিনাথ' নামে পূজিত। তাঁর কাছ থেকেই মৎস্যেন্দ্রনাথ জ্ঞানলাভ করেন এবং পরবর্তীতে তাঁর শিষ্য গোরক্ষনাথ এই ধারার বিস্তার ঘটান। এ সময় মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথ যোগচর্চা, দেহতত্ত্ব, চক্রসাধনাকে কেন্দ্র করে নাথ সম্প্রদায়ের ভিত্তি গড়ে তোলেন।

মৎস্যেন্দ্রনাথকে নাথ সম্প্রদায়ের আদি গুরুরূপে গণ্য করা হয়। তিনি বঙ্গভূমি, অসম, নেপাল, তিব্বত-সহ বিভিন্ন স্থানে নাথ সম্প্রদায়ের প্রচার করেন। গোরক্ষনাথ ছিলেন মৎস্যেন্দ্রনাথের প্রধান শিষ্য। তিনি হঠযোগের প্রবর্তক হিসেবে খ্যাত। গোরক্ষপুর, রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র-সহ অন্যান্য স্থানে নাথ সম্প্রদায় প্রচার ও বিকাশে অগ্রগণ্য ভূমিকা রাখেন। তিনি ভগবান শিবের অবতার রূপে পূজিত হন।

নবনাথ হলেন নাথ ধর্মাবলম্বীদের নয়জন গুরু, সাধক। তাঁরা একক বা সম্মিলিতভাবে পূজিত হন। নবগুরুরা হলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ, জালন্ধরনাথ, কানিফনাথ, চর্পটিনাথ, নাগনাথ, ভর্তৃনাথ, রেবণানাথ, গহিনীনাথ। বিভিন্ন ধারণামতে নবগুরুরা যোগ ও ধ্যানচর্চা, আধ্যাত্মিক দীক্ষা ও শিক্ষা প্রদান, সেবামূলক জীবনযাপন, দর্শনের প্রচার-সহ বিভিন্ন সামাজিক ও আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ড করে থাকতেন। নাথ মতাবলম্বীদের ৮৪ জন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, যাঁরা দেহতত্ত্ব, প্রাণায়াম, কুণ্ডলিনী, যোগ ও তন্ত্রসাধনার মাধ্যমে পরম সিদ্ধি অর্জন করেন। এই ৮৪ সিদ্ধ পুরুষ বিভিন্ন অঞ্চলে নাথ সম্প্রদায়ের সাধন তত্ত্ব প্রচার করেন এবং তাদের অনেকের নামে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। নাথ সম্প্রদায়ের গুরু পরম্পরায় ৮৪ জন সিদ্ধের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

নাথ সম্প্রদায়ের মূল দর্শন হলো 'আত্মজ্ঞানই মুক্তি।' তারা বিশ্বাস করে দেহের মধ্যেই চৈতন্য লুকিয়ে আছে এবং কুণ্ডলিনী জাগরণের মাধ্যমে সেই শক্তিকে জাগিয়ে পরম শিবতত্ত্বে লীন হওয়া যায়। প্রধান সাধনাপদ্ধতি দেহকে 'মন্দির' মনে করা হয়, তাই দেহতত্ত্ব ও যোগসাধনার গুরুত্ব অপরিসীম।

নাথ মতানুসারীদের মধ্যে 'নাথ', 'দেবনাথ', 'শিব' এই তিনটি মূল পদবি। এগুলো শুধুমাত্র নামের অংশ নয়, বরং একটি আধ্যাত্মিক পরিচয়। নাথ সম্প্রদায়ের মূলধারা এই 'নাথ' উপাধিকে আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে। অনেক সাধারণ অনুসারীও তাঁদের নামের শেষে 'নাথ' ব্যবহার করেন। দেবনাথ 'নাথ' মতাবলম্বীদের একটি প্রচলিত পদবি।

নাথ সম্প্রদায়ের অনুগামীরা দেশব্যাপী বিভিন্ন আখড়া (মঠ) প্রতিষ্ঠা করেছেন। উল্লেখযোগ্য নাথ মন্দির হলো গোরক্ষনাথ মঠ (গোরক্ষপুর, উত্তরপ্রদেশ), পশুপতিনাথ মন্দির (নেপাল), মৎস্যেন্দ্রনাথ মন্দির (কাঠমাণ্ডু), চুরাশি নাথ মঠ (রাজস্থান, হিমাচল, গুজরাট), নাথ আখড়া (কলকাতা, অসম, সিলেট অঞ্চলে)।

পার্বত্যরাজ্য ত্রিপুরায় তিনটি গোরক্ষনাথ মন্দির রয়েছে। ধলেশ্বর আগরতলায় মহাযোগী শ্রীশ্রী গোরক্ষনাথ মন্দির। ১৯৮৪ সালে (১৩৯১ বঙ্গাব্দ) নেপালের রাজগুরু ড. নরহরি নাথ মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ২০১৩ সালে নাথ গুরু গোরক্ষনাথের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন মহন্ত শিবনাথ (ওড়িশা) ও স্বামী কৈবল্যনাথ (অসম, বঙ্গাইগাঁও)। মন্দিরটি গোরক্ষপুর মন্দিরের আদলে নির্মিত। ২০১৪ সাল থেকে বর্তমানে বার ভেগ পন্থের সভাপতি যোগী আদিত্যনাথ এই মন্দিরে ২ বার আসেন। প্রতি বছর মন্দিরে ১২টি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়— শুভ নববর্ষ, শ্রীশ্রী গোরক্ষ জয়ন্তী, গুরু পূর্ণিমা, শ্রাবণ মাসের প্রত্যেক সোমবার উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, পৌষ সংক্রান্তি, মহাশিবরাত্রি (সারারাত চতুঃপ্রহর পূজা), মহাশিবরাত্রি উপলক্ষ্যে পারণ উৎসব, দোল উৎসব। মন্দির কমিটি প্রতি বছর গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য অর্থ প্রদান করে। বাকি দু'টির একটি ধর্মনগর ও অন্যটি রানিরবাজারে অবস্থিত।

নাথ সম্প্রদায় গুরু, শিষ্য, দেহ, শক্তি ও চেতনার এক অভূতপূর্ব সংমিলন। শিব থেকে গোরক্ষ, গোরক্ষ থেকে হাজারো নাথগুরু— সবাই মানবমুক্তির, চেতনার এবং যোগের এক নীরব ধারক। □

ভারতে দেশবিরোধী গতিবিধিতে লাগাম টানতে শুধু আইন প্রণয়ন নয়, বরং সেটা কার্যকর হোক

রঞ্জন কুমার দে

ভারতের দেশদ্রোহ আইনটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল বাক্‌স্বাধীনতা, দেশদ্রোহ ও দেশের অখণ্ডতা। ঔপনিবেশিক এই আইন এই কারণে এত বিতর্কিত ছিল যে, কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রায় প্রত্যেকটি সরকার বিরোধীকণ্ঠ এবং সংবাদমাধ্যমকে টুঁটি চেপে ধরে রাখতে এর অপপ্রয়োগ করে আসছিল। উদাহরণস্বরূপ, ২০২১ সালে অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশ শাসকদলের সাংসদ এবং মুখ্যমন্ত্রী জগনমোহন রেড্ডির সমালোচনা করায় দুই নিউজ চ্যানেল টিভি ৫ এবং এবিএন চ্যানেলের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহ মামলা দায়ের করা হয়। সেই মামলায় অভিযুক্তদের মুক্তি ঘোষণা করে দেশদ্রোহ আইনে অযথা দুর্ভোগ না পোহাতে সঠিক বিশ্লেষণে সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে, সমাজে অব্যবস্থা, আইন ভঙ্গ কিংবা দেশকে অস্থিতিশীল করে হিংসা ও উসকানির অপচেষ্টা করলে সেই অপরাধগুলোকে শুধু রাজদ্রোহ আইনে সীমাবদ্ধ রাখা হোক। আবার সুযোগসন্ধানী দেশবিরোধী গোষ্ঠীও আইনটির দুষ্প্রচার এবং বাক্‌স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে আরও বেপরোয়া হতে চায়। ধারা ১২৪(এ)-তে যখন কোনো ব্যক্তি তার কথা কিংবা লিখিত কোনো শব্দ সংকেত তথা দৃশ্যমান সামগ্রী দ্বারা বা অন্য কোনো ঘৃণাসূচক গতিবিধি দ্বারা পরিবেশ উত্তেজিত করার প্রয়াস করে বা সাংবিধানিক কোনো সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করতে গিয়ে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করে, তখন তাকে দেশদ্রোহ বা রাজদ্রোহ বলা হয়।

সুপ্রিম কোর্ট এবং কেন্দ্র সরকার দেশদ্রোহ আইনে সমান্তরাল বিচারের ধারায় বিশ্বাসী। রাজদ্রোহ আইন প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট সর্বদা ১৯৬২ সালের কেদারনাথ সিংহ বনাম বিহার রাজ্য সরকারের রাজদ্রোহ মামলার রায়দান স্মরণ করিয়ে দেয়। ১৯৫৩ সালের ২৬ মে বেগুসরাইয়ে একটি বক্তৃতায় কমিউনিস্ট নেতা কেদারনাথ সিংহ তৎকালীন কংগ্রেস সরকারকে পরাধীন ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে তুলনা করলে রাজদ্রোহ আইনে মামলা হয়। ১৯৬২ সালে সেই মামলায় সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট জবাব ছিল যে, কোনো সরকারের কঠিন শব্দে আলোচনা, সমালোচনা, উপদেশ, গঠনমূলক বিরোধিতা রাজদ্রোহের সমার্থক হতে পারে না, রাজদ্রোহ তখনই হবে যখন কেউ হিংসা, বিদ্বেষের বাতাবরণ ছড়িয়ে পুরো ব্যবস্থা ভঙ্গ করে দেবে। আমরা যে জাতীয়তা নিয়ে আলোচনা করছি, সেই জাতীয়সংগীত প্রণেতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অকপটে স্বীকার করেছিলেন, 'ন্যাশনালিজম্ আমাদের অন্তিম আধ্যাত্মিক লক্ষ্য হতে পারে না, আমার শরণস্থল তো মানবতাই। হীরের মূল্য দিয়ে আমরা কাচ কিনতে পারি না। যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন ন্যাশনালিজম্‌কে মানবতার উপর বিজয়ী হতে দেব না।' স্বাধীনতা সংগ্রামী এম কে গান্ধী ১৯২২ সালে ইয়ং ইন্ডিয়াতে লিখেছিলেন, 'যে কোনো লক্ষ্য প্রাপ্ত করার আগে আমাদের অভিব্যক্তির স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা জরুরি।' অখণ্ড ভারতের চেতনা, চিন্তা স্বাধীন ভারতের সঙ্গে, বিস্তর ফারাক। কারণ, আগে আমাদের লড়াই ছিল বৈদেশিক শক্তির সঙ্গে তাদের স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, আর এখন লড়তে হচ্ছে দেশবিরোধী গতিবিধির বিপরীতে আমাদের সার্বভৌত্ব ও অখণ্ডতার স্বার্থে। রাজদ্রোহ আইনে ইংরেজ শাসনকালে ১৯২২ সালে গান্ধীজী এবং ১৯০৮ সালে বালগঙ্গাধর তিলককে জেল খাটতে হয়েছিল।

ইংল্যান্ড ১৮৭০ সালে ভারতে রাজদ্রোহ আইন বলবৎ করে কিন্তু ভারতীয় সংবিধান লাগু হওয়ার ১৭ মাস পর নতুন একটি বিতর্ক স্থান পেয়েছিল--- বাক্‌স্বাধীনতার পরিধি কতটুকু হওয়া বাঞ্ছনীয় তা নিয়ে। অবশেষে ১৯৫১-তে সংবিধান প্রথম সংশোধিত হয়ে তিনটি নতুন শর্ত সংযোজিত হয়— পাবলিক অর্ডার, অন্যান্য দেশগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং অপরাধ করার জন্য উৎসাহ প্রদান অর্থাৎ কেউ এমন কিছু বলতে বা লিখতে পারবে না যাতে সর্বজনীন শাস্তি বিনষ্ট হয়। অন্যান্য দেশের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক খারাপ হয় এবং হিংসার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। ১৯৫০ সালে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি নেহরু-লিয়াকতের চুক্তির প্রবল বিরোধিতা করতে গিয়ে মন্ত্রীসভা থেকে ইস্তফা দিয়ে অখণ্ড ভারতবর্ষের দাবিতে সর্বজনীনভাবে ভারত-পাক যুদ্ধের আহ্বান দিতে থাকেন। নিরুপায় নেহরু তখন তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেলের পরামর্শে ১৯৫১ সালে বাক্‌স্বাধীনতার অনুচ্ছেদ ১৯ (২) সংশোধন করে তিনটি নতুন শর্ত তথা সার্বজনীন শাস্তি ভঙ্গ, অপরাধ করার জন্য উসকানি এবং অন্য দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক খারাপ করার মতো অভিব্যক্তিকেও নিষেধাজ্ঞায় জুড়ে দেন। সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করার চেষ্টা করে কংগ্রেস।

যদিও বাক্‌স্বাধীনতার ঢালে দেশের

ফঃ ৫

অখণ্ডতা, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ তথা বিদ্রূপ করার ট্র্যাডিশন বামপন্থীদের রয়েছে। আমরা দেখেছি জেএনইউ প্রাঙ্গণে কমিউনিস্ট ছাত্রনেতাদের ভারত বিরোধী স্লোগান 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে ইনশা আল্লা ইনশা আল্লা' ইত্যাদি। ২০২০ সালে এনআরসি বিরোধী এক জনসভায় ১৯ বর্ষীয় বামপন্থী ছাত্রী অমূল্য লিয়েনা স্লোগান দিতে থাকে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'। বিগত ভারত-পাক প্রায় প্রতিটি ম্যাচে দেখা যায় দেশবিরোধী আস্ফালন। এগুলো আমাদের দেখতে হয় হয়তো ভারতের অতি সহনশীল আইনব্যবস্থার জন্য। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সুদর্শন রেড্ডির ভাষায়, পাকিস্তান জিন্দাবাদ স্লোগান ততক্ষণ পর্যন্ত অপরাধ নয়, যতক্ষণে পাকিস্তানকে শত্রুদেশ ঘোষণা না করা হয় কিংবা ভারত-পাকের মধ্যে কোনো যুদ্ধ চলছে। অথচ আশ্চর্যের কথা, ২০১৬ সালে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট ম্যাচ চলাকালীন বিরাট কোহলির পাকিস্তানি এক ভক্ত উমর দারোয়জ ভারতের বিজয়ে ভারতের পতাকা উত্তোলন করায় পাকিস্তান আদালত সেই ব্যক্তিকে ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেয়।

প্রকৃতপক্ষে রাজদ্রোহ আইনের প্রতিশোধমূলক মানসিকতার ফলে প্রচুর অপপ্রয়োগ হয়েছে, যার জ্বলন্ত প্রমাণ ২০১৪ থেকে ২০১৯-এর ক্রাইম ডাটা। এই পরিসংখ্যান অনুযায়ী উল্লিখিত ছ'টি বছরে ৩৩৭টি দেশদ্রোহিতার চার্জশিট ফাইল হয়েছিল এবং গ্রেপ্তার হয়েছিল ৫৫৯ জন, কিন্তু দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল মাত্র ১০ জন। ফলস্বরূপ, সুপ্রিম কোর্ট বিতর্কিত আইনটি নিয়ে কেন্দ্র সরকারের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে বিস্ময় প্রকাশ করে। তবে কেন্দ্র সরকারের জবাব ছিল, ১২৪ (এ) ধারাটির বিলুপ্তির কোনো প্রয়োজন নেই, বরং আইনটির দিশানির্দেশ সঠিক নির্ধারণ করে আইনটির আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা হোক। ২০১৯ সালে রাজ্যসভায় দেশদ্রোহ আইন বিলুপ্তি নিয়ে একটি প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের স্পষ্ট জবাব ছিল, দেশদ্রোহী অপরাধজনিত কোনো ধারা বিলুপ্তির কোনো প্রস্তাব সরকারের কাছে নেই। ২০১৮ সালে ভারতীয় ল' কমিশন রাজদ্রোহ আইনের উপর একটি পরামর্শপত্র জারি করে উল্লেখ করে যে, আইনটি ব্যক্তিগত অথবা রাজনৈতিক আক্রোশ মেটানোর কাজে ব্যবহার না করে যেন গুরুতর অপরাধে প্রয়োগ করা হয়।

বিগত বেশ কয়েকটি রাজদ্রোহ মামলার বিতর্কে ও চাপে কেন্দ্র সরকার আইনটি সমীক্ষা তথা পুনর্বিবেচনার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

বিতর্কিত এই আইনটিকে পুরোপুরি বিলুপ্ত না করে কেন্দ্র সরকার যথারীতি নতুন আইন 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা'য় রূপান্তরিত ও অন্তর্ভুক্ত করে। ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও অখণ্ডতায় বিপদস্বরূপ এমন যে কোনো কর্মকাণ্ডে দোষী ব্যক্তির শাস্তির মেয়াদ ন্যূনতম সাত বছর থেকে সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন বা মৃত্যুদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। আমরা আগে দেখেছি জেএনইউ প্রাঙ্গণে ভারত বিরোধী স্লোগান, তাছাড়া পুলওয়ামা আক্রমণ, ধারা ৩৭০ রদ, এমনকী সম্প্রতি পহেলগাঁও জঙ্গিকাণ্ডেও বিশেষ একটি শ্রেণীর পাকিস্তান প্রীতি এবং ভারত বিরোধী গতিবিধি। সম্প্রতি অসম-সহ দেশজুড়ে প্রায় হাজার খানেক দেশদ্রোহী গ্রেপ্তার করা হলেও এরা আইনের ফাঁক গলে জামিন নিয়ে অবশেষে সসম্মানে মুক্তি পেয়ে যায়। দেশদ্রোহীদের এইসব বেপরোয়া মন্তব্য, কার্যকলাপ সত্যি সাধারণ ভারতপ্রিয় সকল নাগরিকদের মনে খুব পীড়া দেয়। গত জুন মাসে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট কলকাতার ওয়াজাত খানের সোশ্যাল মিডিয়ায় হিন্দু বিরোধী পোস্টের পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্ট জানায় যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘৃণা বা হিংসা ছড়ানো কোনো বাক্স্বাধীনতা নয়। সম্প্রতি গৌহাটি হাইকোর্টও ফেসবুকে এক ব্যক্তির পাকিস্তান ও তুরস্কের সমর্থনে পোস্ট করায় তার জামিন খারিজ করে বলে যে, এটা স্পষ্ট, অভিযুক্ত ফেসবুকে ভারতকে সমর্থন না করে পাকিস্তানকে করেছেন যেটায় ৪১ (ক) অনুচ্ছেদকে উলঙ্ঘন করা হয়েছে। ভারতে আইনের শাসন শুধু কাগজ-কলমে সীমাবদ্ধ না হয়ে এখন দেশদ্রোহীদের উপর খড়্গ হস্তে বর্ষিত হোক যাতে ভবিষ্যতে এরকম দেশদ্রোহিতার কাজ দ্বিতীয়বার ঘটাতে কেউ দু'বার চিন্তা করে। □

Medmitra Bijonsikha Group

A-10/2, Purbadiganta, Santoshpur, Kolkata - 700 075
Mobile : +91 7980124001, E-mail : customercare@bijonsikha.com
Website : www.bijonsikha.com

Associated with manipalhospitals

আমরা বয়স্কদের বিভিন্ন পরিষেবা দিয়ে থাকি

- এছাড়াও আমরা বাড়িতে ডাক্তার / নার্স / ফিজিওথেরাপিস্ট / অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা দিয়ে থাকি।
- সমস্ত রকম প্যাথলজিক্যাল টেস্ট ১৫ থেকে ২০ শতাংশ ছাড়ে লিউপিন ডায়গনস্টিকস্ থেকে করিয়ে থাকি।
- সমস্ত রকম মেডিক্যাল যন্ত্র আমরা ভাড়ায় দিয়ে থাকি।
  Oxygen Concentrator | Pulse Oximeters | Walkers
  Suction Machine | Multi Parameter Monitors | Nebulizer
  Wheelchair | Hospital Beds | Air Mattresses

আমরা বাড়িতে গিয়ে এই পরিষেবাগুলি দিয়ে থাকি —
Holter | ECG | Uroflometry | ABPM | EEG | EMG | NCV | SSEP | RNS | BAER | VEP | PFT | PSG (Sleep Apnea) | Portable Ventilator | ABPM

আমরা মাসিক ২,৯৯৯/- টাকার বিনিময়ে CGHS কর্মচারীদের বিভিন্ন পরিষেবা দিয়ে থাকি

- মুদিখানা বাজার - মাসে একবার
- ব্যাংক থেকে টাকা তোলা - মাসে একবার
- আপৎকালীন সময়ে হাসপাতালে ভর্তির সহযোগীতা
- ডাক্তারের চেম্বারে অথবা CGHS ডিসপেনসারীতে নিয়ে যাওয়া আসা - মাসে একবার
- CGHS ডিসপেনসারী থেকে ওষুধ এনে দেওয়া - মাসে একবার
- ১৫ থেকে ২০ শতাংশ ছাড় সমস্ত প্যাথলোজিক্যাল পরীক্ষার ওপর
- **৩ মাসের অগ্রিম টাকা দিলে দু'বার বাড়িতে ডাক্তার পরিষেবা বিনামূল্যে**

বাংলা ভাষা এবং বাংলাদেশি ভাষা

ড. চন্দ্রশেখর মণ্ডল

তর্ক চলছিল দুজনের। বিষয় ভাষা। নেহাতই শ্রোতা আমি। বেশিরভাগ বাঙ্গালি চরিত্রের মতো। 'একটা বাংলা বাক্য বল্ দেখি?' অন্যজন বলল— 'বহুত মেহনত করে বাংলা বলছো, ফটাফট বলো, কেন কি আমার বহুত তাড়া আছে?' পাশে বসে থাকা সেই আমি তখন পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবী। বুদ্ধিজীবী কিনা জানি না। তবে আঁতেল নিশ্চিত। বিরক্ত হয়ে বলেই ফেললাম— 'উচ্ছন্নে গেছে আজকালকার ছেলেপুলেরা। কয়েকটা হিন্দি শব্দ জুড়ে দিয়ে বলছে বাংলা!' কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই তাদের। আরেকজন বললে এটা শোন্— 'গোসল করে খালার দাওয়াতে গিয়ে গোস্ত দিয়ে নাস্তা করার পর পানি খেলাম।' তৃপ্তিতে মাথা নাড়লাম। ঠিক ঠিক। এ না হলে বাংলা ভাষা! বেশিরভাগ বাঙ্গালির মগজে এই রোগ ঢুকে আছে। সে রোগ রাজনৈতিক, ধর্মভিত্তিক। চলে আসতে আসতে কানে আসছিল— 'গুগল কিংবা কম্পিউটার অপশানে 'বাংলা (ভারত)' এবং আলাদা করে 'বাংলা (বাংলাদেশ)' লেখা থাকে। কেন... বে?'

কথোপোকথনের প্রথমটি হিন্দি আগ্রাসনের বাংলা ভাষা। দ্বিতীয়টিও জোর করে চাপানো ভাষা। উর্দু দালালদের বাংলা ভাষা। ইসলাম বিস্তারের বাংলা। প্রথমটি বাংলা না হলে, দ্বিতীয়টিও কোনোভাবেই বাংলা নয়। এই সত্য উপলব্ধি করতে হবে প্রতিটি বাঙ্গালিকে। বুঝতে হবে যেভাবে, যেদিক দিয়েই বোঝানোর চেষ্টা হোক না কেন, দুটোর কোনোটাই বাংলা ভাষা নয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষা নয়। 'আ মরি বাংলা ভাষা'র সুর নয়।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে ঘুরতে থাকা কবি, সাহিত্যিক, অভিনেতা, গায়ক প্রথমটিকে বাংলা ভাষা নয় বলে খিল্লি করেন। বলেন হিন্দি আগ্রাসন। অথচ দ্বিতীয়টিকে বাংলা ভাষা বলে ঘোষণা করেন। বগল বাজান। এটা গোদা বাংলায় অশ্লীল উর্দু তাঁবেদারি। ইসলামীকরণের সুতীব্র লালসা। এটা তাঁদের ভাষা অজ্ঞতা নয়। কারণটা এক্কেবারে অর্থনৈতিক। বইয়ের বাজারে, সিনেমার বাজারে, নাটকের বাজারে নিজেদের বিক্রি হওয়ার দর কমে যাওয়ার আতঙ্ক। আছে ভাতাজীবীদের সরকারি অনুগ্রহ হারানোর ভয়। এরা বাংলায় কথা বলেন, কিন্তু ভারতীয়'র চেয়ে বেশি করে বাংলাদেশি। এরা ভারত বিরোধী, পাকিস্তানপন্থী। ভারত থেকে বাংলাকে আলাদা করে বাংলাদেশে সংযুক্তির জেহাদি ভাবনার প্রচারক। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের ভাষা 'হিন্দুয়ানী'র ভাষা— সেই ঘোষণার সমর্থক।

১৯৫২-এর 'ভাষা আন্দোলন' মূলত মুসলমানদের ছিল। এই আন্দোলনের পেছনে বাংলা ভাষার প্রতি আবেগের চেয়ে বেশি ছিল তাদের আর্থিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা। ছিল বিহারি-পঞ্জাবিদের চাকরি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেয়ে যাওয়ার আতঙ্ক।

তখনও মুখ্যত তাদের ভাষা ছিল উর্দু। উর্দু ভাষার উৎপত্তি পঞ্জাবে। বিস্তার ও বিকাশ হরিয়াণা, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও তেলেঙ্গানা-সহ দক্ষিণ ভারতে। অবিভক্ত বঙ্গে উর্দুর প্রভাব তখনও সীমিত ছিল। এই উর্দু ভাষা সরকারি স্বীকৃতি লাভ করেছে মাত্র কয়েকশো বছর আগে। শাহজাহানের আমলে (১৬২৮-১৬৫৮)। আজকের 'মুসলমানদের ভাষা হিসেবে যে উর্দুকে উপস্থাপন করা হচ্ছে, তার জন্ম এই হিন্দুস্থানে। হিন্দি বা হিন্দুস্থানি ভাষা থেকে। 'উর্দু' শব্দের অর্থ সৈন্য।

পাঠান-মুঘল সময়কালেও ভারতে ফার্সি ছিল রাজ ভাষা। এমনকী ইংরেজ রাজত্বের প্রথমভাগেও রাজভাষা ছিল ফার্সি। কবি আমির খসরুর সব রচনা ফার্সিতে। 'হিন্দি' বা 'হিন্দুস্থানি' ভাষার ব্যুৎপত্তি এই ফার্সি থেকে। ফার্সি শব্দের মিশ্রিত আরবি-ফার্সি-তুর্কি থেকে। ১২০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। বাংলা ভাষা আরও প্রাচীন ভাষা। রচনাকাল খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক। 'চর্যাপদ'কে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন লিখিত পুঁথি ধরলে বাংলা ভাষার বয়স মোটামুটি ১৬০০ বছর।

বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। বাংলা ভাষার উর্দুকরণের কাজটা স্বাধীন বাংলাদেশ করে ফেলেছে। এবারের টার্গেট পশ্চিমবঙ্গের বাংলা। সেই মোল্লাবাদী মাস্তানরা এখন বাংলা ভাষা-সাহিত্য-শিল্প- সংস্কৃতি'র ঠিকাদার। যারা রবীন্দ্রনাথের 'বাংলা ভাষা'কে মুছে ফেলার চেষ্টায় নেমেছে, তাদের দাবি বাংলা ভাষা 'হিন্দুদের ভাষা', 'সনাতনীদের ভাষা'। হাতুড়ি শাবল চালিয়েছে রবীন্দ্রনাথের মূর্তিতে। ভেঙেছে রবি ঠাকুরের কাছারি বাড়ি। সত্যজিৎ রায়ের পৈতৃক বাড়ির উঠোন। নালন্দা স্মৃতি উসকে 'ইন্দিরা গান্ধী কালচারাল ইনস্টিটিউশন'-এর হাজার হাজার বই পুড়িয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্রিকেটার 'হিন্দু' রবীন্দ্রনাথের গান 'আমার সোনার বাংলা' গাওয়ার সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকেছেন। তারা শেখাবে বাংলা ভাষা? পশ্চিমবঙ্গে বসে যারাই এর সমর্থক, তারাই আজ 'ভাষা আন্দোলন'-এর নামে নাটক করছে। তারা মূলত কলকাতার বাবু-বিবি। যারা মেদিনীপুরের ভাষা, বাঁকুড়ার ভাষা, উত্তরবঙ্গের ভাষা নিয়ে বিস্তর খিল্লি করেছে। 'শ', 'ষ', 'স' উচ্চারণের জ্ঞান দিয়ে দিস্তা দিস্তা কাগজ নামিয়েছেন।

সব ভাষাই অন্য ভাষা থেকে গ্রহণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়। শুধু গ্রহণ নয়, আত্তীকরণই তার অগ্রগতির মাপকাঠি। ইংরেজি সে-কারণে পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ ভাষা। বাংলায় 'বাবা' ফার্সি শব্দ। বাংলা ভাষার সঙ্গে তার সম্পৃক্ততা তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে উর্দু শব্দ 'আব্বা' জোর করে চাপানো । পরিকল্পিত উর্দু আগ্রাসন। এই ষড়যন্ত্র বুঝলেই বোঝা যাবে বাংলাভাষা ও বাংলাদেশি ভাষার পার্থক্য। □

স্যাপ চ্যাম্পিয়নশিপে দুর্দান্ত সাফল্য ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলের

নিলয় সামন্ত

থিম্পুর চাংলিমিথাং স্টেডিয়ামে তাদের উদ্বোধনী ম্যাচে নেপালকে ৭-০ গোলে হারিয়ে ভারতের অনূর্ধ্ব-১৭ মহিলা ফুটবল দল তাদের স্যাফ অনূর্ধ্ব-১৭ মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫ অভিযানে দুর্দান্ত সূচনা করেছে।

নীরা চানু লংজাম (২৫', ৫৬'), অভিস্তা বাসনেট (১৬', ৪১') এবং অনুষ্কা কুমারীর (৩৭', ৬২') গোল এবং অধিনায়ক জুলান নংমাইথেমের (৪৫+১') গোল ইয়ং টাইগ্রেসদের দুর্দান্ত জয় এনে দেয়।

ভারত শুরুতেই তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে, হাফ টাইমে ৫-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায়, যার ফলে নেপালের ম্যাচ পুনরুদ্ধারের আর কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

১৬তম মিনিটে শ্বেতা রানির কর্নার থেকে নেপালের গোলরক্ষক ঝর্না ডুমরাকোটির ভুলের কারণে বাসনেটকে গোলের সুযোগ করে দেয়।

নয় মিনিটে পর কুমারীর থ্রু বল নীরা চানুকে ছেড়ে দেয়, যিনি নির্ভুলতার সঙ্গে শেষ করে দলকে ২-০ গোলে এগিয়ে দেন। এর কিছুক্ষণ পরেই কুমারী গোলরক্ষককে পরাজিত করার জন্য ধৈর্য দেখিয়ে স্কোরশিটে নিজের নাম যোগ করেন। বাসনেটের দ্বিতীয় এবং হাফ টাইমের শুরুতে নংমাইথেমের গোল ভারতকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা দেয়।

খেলা পুনরায় শুরু হওয়ার পরও আধিপত্য অব্যাহত ছিল। ৫৬তম মিনিটে চানুর শক্তিশালী ফিনিশিং তার জোড়া গোলের সমাপ্তি ঘটায়। এরপর ৬২তম মিনিটে কুমারী বাসনেটের একটি চতুর পদক্ষেপে তার দ্বিতীয় গোলটি করেন।

জানুয়ারি থেকে কয়েক মাসের যৌথ অনুশীলনের ফলে ভারতের ঐক্য স্পষ্ট ছিল। মিডফিল্ড তীক্ষ্ণ পাসিং দিয়ে গতি নিয়ন্ত্রণ করেছিল, ফরোয়ার্ডরা সহজেই জায়গা পেয়েছিল এবং গোলরক্ষক মুন্নির নেতৃত্বে ব্যাকলাইন দৃঢ়ভাবে ধরে রেখে ক্লিন শিট নিশ্চিত করেছিল।

এই বছর প্রতিযোগিতাটি ডাবল রাউন্ড-রবিন ফর্ম্যাটে অনুষ্ঠিত হওয়ায়, এই গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল ভারতকে সামনের ম্যাচগুলির জন্য একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে এবং তার আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের জন্য একটি সতর্কবার্তা পাঠায়।

থিম্পুর চাংলিমিথাং স্টেডিয়ামে প্রথমার্ধেই এক গোলে পিছিয়ে পড়েন আলপি-অর্পিতারা। দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশ মাঝে মধ্যে আক্রমণ করলেও বেশিরভাগ সময়ই প্রতিপক্ষের আক্রমণ ঠেকিয়ে পার করেছে। এর মধ্যে ভারতও স্কোরলাইন ২-০ করে নেয়।

আগের দিন সহকারী কোচ আবুল হোসেন বলেছিলেন ভারতের সঙ্গে ভুল করতে চায় না বাংলাদেশ। কিন্তু মাঠে সেই ভুলটাই হলো। কোচ মাহবুবুর রহমানের কৌশলও হলো প্রশ্নবিদ্ধ। ভারতের মতো দারুণ ছন্দে থাকা দলের সঙ্গে হাইলাইন ডিফেন্স দাঁড় করানোর মাশুল দিতে হলো দুই গোলে হেরে।

বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ মহিলা ফুটবল দলের পাঁচ ম্যাচের জয়যাত্রা থেমে গেল এই হারে। শেষবার বাংলাদেশ হেরেছিল ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে, অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৪-০ গোলে।

ম্যাচটা বাংলাদেশের জন্য সহজ ছিল না। ভারতের বিপক্ষে আজকের আগে বাংলাদেশের মেয়েরা সর্বশেষ খেলেছিল ২০২৪ সালে স্যাফ অনূর্ধ্ব-১৬ পর্যায়ে। যেখানে গ্রুপ পর্বে তারা ভারতকে হারিয়েছিল ৩-১ গোলে আর ফাইনালে টাইব্রেকারে।

শুক্রবার ম্যাচের ১৪

মিনিটেই গোল হজম করে বাংলাদেশ। মাঝমাঠ থেকে বল কেড়ে নেন ভারতের এক ফুটবলার। এরপর বাংলাদেশের তিন খেলোয়াড়কে ড্রিবল করে ডি-বক্সের সামনে পাস দেন। সেই পাস ধরে চমৎকার শটে বাংলাদেশের জালে বল পাঠান ভারতের পার্ল ফার্নান্ডেজ। বাংলাদেশের গোলকিপার ইয়ারজান বেগম চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পারেননি সেই শট রুখতে।

এক গোল হজমের পর বাংলাদেশ চেষ্টা করে যায় ম্যাচে সমতা ফেরাতে। গোল হজম করার পরও লড়াই ছাড়েনি বাংলাদেশ। কয়েকটি ভালো আক্রমণ গড়েছিল। ৩৬ মিনিটে ফাতেমা আক্তারের কর্নার থেকে হেড নিলেও লক্ষ্যে রাখতে পারেননি আলাপি আক্তার।

বিরতির পর গোল শোধ তো দূরের কথা, উলটো আরেক গোল হজম করতে হয়। ৭৬ মিনিটে আলিশার কর্নার থেকে নিখুঁত ভলিতে জাল কাঁপান ভারতের বনিপিলা শুলাই।

নেপালকে ৭-০ গোলে উড়িয়ে এবারের স্যাফ অনূর্ধ্ব-১৭ টুর্নামেন্ট শুরু করেছে ভারত।

গোলের বন্যা ভারতের। অনূর্ধ্ব-১৭ মহিলা স্যাফ চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের প্রমীলাবাহিনীর দুর্দান্ত সাফল্য। থিম্পুর চাংলিমিথাং স্টেডিয়ামে, ভুটানের বিরুদ্ধে ৮-০ গোলের জয় পেল ব্লু-টাইগ্রেসরা।

ম্যাচের শুরু থেকেই দাপট দেখাতে শুরু করে অনূর্ধ্ব-১৭ ভারতীয় মহিলা ফুটবল দল। মাঝ মাঠ থেকে আক্রমণ কিংবা উইং অ্যাটাক থেকে থেকে ডিফেন্স, সবদিক দিয়ে বাজিমাত করেছে ভারতের মেয়েরা।

ভুটানের রক্ষণভাগের ফুটবলাররা কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়েন। এই ম্যাচে প্রথমার্ধেই ভারত ৪-০ গোলে এগিয়ে যায়। এই ম্যাচে দলের অধিনায়কা অনুষ্কা কুমারী হ্যাটট্রিক করেন। অনুষ্কা এদিন ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ গোল স্কোরার। অন্যদিকে, অভিস্তা বাসনেট দুটি গোল করেন। পার্ল ফার্নান্ডেজ, দিব্যানী লিন্ডা এবং ভালাইনা ফার্নান্ডেজ ম্যাচের শেষ দিকে তিনটি গোল করে ভুটানের বিরুদ্ধে ব্যবধান আরও বাড়ান।

দলের মিডফিল্ডাররা ঠিক যেভাবে খেলা তৈরি করেছেন এবং একইভাবে পালটা কাউন্টার অ্যাটাকও তুলে এনেছেন। গোটা ম্যাচেই রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রা যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন। আর এই জয়ের ফলে তিন পয়েন্ট পেল ভারত। সেইসঙ্গে গোল পার্থক্যেও তারা অনেকটা এগিয়ে গেল। এই মুহূর্তে ভারত তিন ম্যাচে নয় পয়েন্ট এবং ১৭ গোলের ব্যবধান নিয়ে লিগ টেবিলের একেবারে শীর্ষে রয়েছে।

তবে নিঃসন্দেহে গোলের বন্যা বইয়ে দিল ভারত। অনূর্ধ্ব-১৭ মহিলা স্যাফ চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের প্রমীলাবাহিনী যেন জ্বলে উঠল এবং পেল দুর্দান্ত সাফল্য। থিম্পুর চাংমিমিথাং স্টেডিয়ামে ভুটানের বিরুদ্ধে ৮-০ গোলের জয় ব্লু-টাইগ্রেসদের।

এই ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেন ভারতীয় দলের অধিনায়িকা অনুষ্কা। মাঝমাঠ থেকে আক্রমণ কিংবা উইং অ্যাটাক থেকে থেকে ডিফেন্স, সবদিক দিয়েই বাজিমাত করেছে ভারতের মেয়েরা।

চার দেশের (বাংলাদেশ, ভারত, ভুটান ও নেপাল) এই টুর্নামেন্টে খেলা হচ্ছে ডাবল লিগ পদ্ধতিতে।

অপরদিকে কম্বোডিয়ার নমপেনে ন্যাশনাল স্পোর্টস কমপ্লেক্সে এএফসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগের যাত্রা জয় দিয়ে শুরু করল ইস্টবেঙ্গল। প্রাথমিক পর্বের প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ নমপেন ক্রাউনকে ১-০ গোলে হারিয়ে দিল মশাল গার্লসরা। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে জয়সূচক গোল ফাজিলার।

অবশেষে ইস্টবেঙ্গল ফনম পেন ক্রাউনের রক্ষণভাগ ভেদ করতে সক্ষম হয়। রেস্টি বল নিয়ে বক্সের ভেতরে ঢুকে পড়েন এবং দেখেন ফাজিলা দূরের পোস্ট দিয়ে দৌড়াচ্ছেন। রেস্টি নিখুঁত একটি পাস বাড়ান ফাজিলার দিকে, আর ফাজিলা কাছ থেকে গোল করতে কোনো ভুল করেননি।

ফলম পেনের গোলকিপার ফারিয়া ফাজিলার উপর চরম ফাউল করার জন্য সরাসরি লাল কার্ড দেখেছেন। বলের পেছনে ছুটছিলেন দুজনেই, সেই সময় ফারিয়া বক্সের বাইরে গিয়ে ফাজিলার ওপর একটি ভয়ংকর ট্যাকল করেন, যা সম্পূর্ণভাবে ভুল সময়ে করা হয়। সংঘর্ষের পরে দুজনেই মাটিতে পড়ে যান। ফারিয়া সেরে ওঠার পরেই রেফারি তাকে লাল কার্ড দেখান।

এদিন শুরু থেকেই সঙ্গীতা বাসফোর, শিল্কি দেবীরা কিছুটা সাবধানী ফুটবল খেলতে থাকেন। রক্ষণ মজবুত রেখে প্রতিপক্ষকে বুঝে নিয়ে আক্রমণে উঠতে দেখা যায় অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজের ইস্টবেঙ্গলকে। বেশ কয়েকবার গোলের কাছাকাছি পৌঁছলেও গোল করতে ব্যর্থ হয় লাল-হলুদ। ৪২ মিনিটে ইস্টবেঙ্গলের ফাজিলা ইকওয়াপুট গোল করলেও তা বাতিল হয়। প্রথমার্ধে স্কোর লাইন থাকে ০-০।

ইস্টবেঙ্গল এই সময় মুহুর্মুহু আক্রমণ শানালেও গোল আসছিল না। অবশেষে কাঙ্ক্ষিত গোলের দেখা মেলে ৭০ মিনিটে। নমপেন ক্রাউনের রক্ষণভাগ ভেঙে গোল করেন উগান্ডার স্ট্রাইকার ফাজিলা ইকওয়াপুট। গোলের পর উজ্জীবিত ফুটবল উপহার দেয় ইস্টবেঙ্গল। ৭৮ মিনিটে নমপেন ক্রাউনের অধিনায়কা কিম চ্যানখেট চোট পান। তাঁকে স্ট্রেচারে করে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। শেষমেশ আর কোনো গোল না হওয়ায় ম্যাচ জিতে মাঠ ছাড়েন ইস্টবেঙ্গলের মেয়েরা। গত ৩১ আগস্ট একই মাঠে অপর ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ হংকঙের কিচি এফসি। □

শান্তি

বোধিসত্ত্ব একবার কাশীতে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রণ করে বহু বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। পরে তিনি একটি সুন্দর ও নিরিবিলি জায়গা দেখে একটি আশ্রম তৈরি করেন।

বোধিসত্ত্বের আশ্রমে বহু বিদ্যার্থী আসতেন বেদপাঠ করতে। বিদ্যার্থীদের মধ্যে খুব অহংকারী ছিল শ্বেতকেতু। সে একদিন আশ্রমের অন্যান্যদের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছে নগরের বাইরে। হঠাৎ তাদের নজরে পড়ল এক চণ্ডাল। শ্বেতকেতু ভাবল, এই চণ্ডালের স্পর্শে বাতাস অপবিত্র হয়ে যাচ্ছে, সেই বাতাস তার গায়ে লেগে সেও অপবিত্র হয়ে যাচ্ছে। শ্বেতকেতু অত্যন্ত রেগে চণ্ডালের দিকে এগিয়ে গেল। বলল, এই ব্যাটা চণ্ডাল, তোর তো সাহস কম নয়, আমার আগে আগে চলছিস কেন? চণ্ডালও দমবার পাত্র নয়। সে আরও জোরে জোরে চলতে লাগল। অবশেষে শ্বেতকেতু জোরে হেঁটে চণ্ডালের মুখোমুখি হলো। চণ্ডাল শ্বেতকেতুকে বলল, তুমি কে বাপু যে তোমাকে রাস্তা ছেড়ে দিতে হবে?

শ্বেতকেতু বলল, আমি ব্রাহ্মণ সন্তান। চণ্ডাল বলল, তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান! তাহলে তো তুমি শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয় জানো? শ্বেতকেতু বলল, অবশ্যই। আমার শাস্ত্রজ্ঞান খুব প্রখর। চণ্ডাল তখন শ্বেতকেতুর বন্ধুদের বলল, দেখো, তোমাদের বন্ধু শাস্ত্র নিয়ে আমার সঙ্গে তর্ক করতে চাইছে। তর্কে যদি আমি হেরে যাই তবে আমি রাস্তা ছেড়ে দাঁড়াব। আর তোমাদের বন্ধু যদি হেরে যায় তাহলে আমার পায়ের ফাঁক দিয়ে মাথা নীচু হয়ে তাকে যেতে হবে।

শ্বেতকেতু চণ্ডালের শর্তে রাজি হয়ে বলল, এ কোনো ব্যাপারই নয়। চণ্ডাল শ্বেতকেতুকে প্রশ্ন করল, আচ্ছা বলো তো, দিক বলতে তুমি কী বোঝ? শ্বেতকেতু বলল

এ তো খুব সহজ প্রশ্ন, পূর্ব-পশ্চিম- উত্তর-দক্ষিণ এই হলো চার দিক। চণ্ডাল বলল এই তোমার শাস্ত্রজ্ঞান! সে এবার শ্বেতকেতুকে জোর করে পায়ের ফাঁক দিয়ে মাথা নীচু করে বেশ কয়েক পা হাঁটিয়ে ছাড়ল। শ্বেতকেতু রাগে, দুঃখে জ্বলতে লাগল।

আশ্রমে ফিরে শিষ্যরা বোধিসত্ত্বকে পথের সেই ঘটনার কথা সবিস্তারে বলল। বোধিসত্ত্ব তখন শ্বেতকেতুকে ডেকে বললেন, সেই ব্যক্তিটি সত্যিই খুবই জ্ঞানী। সে তোমাকে কোনো সাধারণ দিকের কথা জিজ্ঞাসা করেনি। মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিকের কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল। শোন, বাবা-মা হলেন পূর্বদিক, দক্ষিণ দিক হলো গুরুদেবের, সুগৃহস্থ হলো উত্তর দিক আর যার সান্নিধ্যে মানব জন্ম সার্থক হয়ে ওঠে তা হলো পশ্চিম দিক।

শ্বেতকেতু বুঝল সত্যিই তার ভুল হয়েছে। ভুল বুঝতে পারলেও তার অপমানের জ্বালা শান্ত হলো না। সেই রাতেই আশ্রম ত্যাগ করল শ্বেতকেতু। প্রথমে গেল সে তক্ষশিলায়। সেখানে বিভিন্ন পণ্ডিতদের সান্নিধ্যে নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করল। এভাবে সে নানা বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠল। তারপর তপস্বীদের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে এক রাজদরবারে এসে উপস্থিত হলো। রাজা তাদের দেখে খুব খুশি হলেন। রাজা তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। তপস্বীরা আনন্দে দিন কাটাতে লাগল।

একদিন রাজা ঠিক করলেন তপস্বীদের সঙ্গে দেখা করে তাদের তপস্যার শক্তি দেখবেন। রাজা অনুচরের মাধ্যমে তপস্বীদের সে খবর পাঠালেন। শ্বেতকেতু তখন তপস্বীদের বলল, সিদ্ধাই ক্ষমতার প্রদর্শন করে রাজাকে সন্তুষ্ট করতে পারলে তাদের আর কোনো অভাব থাকবে না। তাই রাজা আসতেই তারা নানারকম ভেল্কি দেখিয়ে রাজাকে সন্তুষ্ট করল। রাজা প্রধান পুরোহিতকে বললেন, সত্যি এদের তপস্যার শক্তি আছে। পুরোহিত বললেন, না মহারাজ, এরা শাস্ত্রজ্ঞ তপস্বী নয়, শুধু কয়েকটা ভেলকি জানে।

শ্বেতকেতু বুঝতে পারল, পুরোহিত তাদের সব কারসাজি ধরে ফেলেছে। তার সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। তারা আগের মতো আর রাজার আপ্যায়ন পাচ্ছে না। সকলেই শ্বেতকেতুর ওপর রেগে গেল।

কাজেই শ্বেতকেতু একদিন পুরোহিতের সঙ্গে তর্ক করার জন্য রাজপ্রাসাদে গেল। সে বলল, আমরা তো সর্বশাস্ত্রবিশারদ। পুরোহিত বললেন, শাস্ত্রপাঠে কীর্তি, যশ এলেও শান্তি আসে না। শ্বেতকেতু বলল, শান্তি কীভাবে আসে? পুরোহিত বললেন, চরিত্র ও সংযম আনে শান্তি।

শ্বেতকেতু দেখল, আবার সে হেরে গেল। মহারাজ তপস্বীদের ডেকে বললেন, তোমরা তপস্যা ছেড়ে গৃহী হও। তোমরা আমার সেনাবাহিনীতে যোগদান কর, তাহলে তোমাদের কোনো অভাব থাকবে না।

শ্বেতকেতু আর তপস্বীরা কোনো উপায় না দেখে মহারাজের কথায় রাজি হলো।

সংগৃহীত

জাতীয় উদ্যান

দাচিগাম

দাচিগাম জাতীয় উদ্যান কাশ্মীরের শ্রীনগর জেলা থেকে ২২ কিলোমিটার দূরে ডালহ্রদের পূর্বদিকে অবস্থিত। এটি ১৪১ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। স্থানীয় ভাষায় দাচিগামের অর্থ দশটি গ্রাম যা পার্ক গঠনের জন্য যে দশটি গ্রামকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। এটি আগে উদ্যানটি কাশ্মীরের মহারাজার তত্ত্বাবধানে ছিল, ভারতভুক্তির পর সরকারি আওতায় আনা হয়। ১৯৮১ সালে এটিকে সংস্কারিত করে জাতীয় উদ্যান ঘোষণা করা হয়। উদ্যানের ভেতরে উঁচুতে রয়েছে মারসার হ্রদ, যেখান থেকে দাগওয়ান নদী প্রবাহিত হয়েছে। শীতকাল ছাড়া এই উদ্যান সবুজ গাছপালা এবং রঙিন ফুলে ঢাকা থাকে। এই উদ্যানে কস্তুরি হরিণ, তুষার চিতা, চিতা বেড়াল, কালো ভালুক, বাদামি ভালুক, পাহাড়ি শেয়াল প্রভৃতি নানা প্রজাতির জীবজন্তু দেখা যায়। তেমনই নানা জাতের পাখিরও আবাসস্থল।

এসো সংস্কৃত শিখি-৮২

অভ্যাসং কুর্ম: –

সখী নৃত্যতি। সখ্য: নৃত্যন্তি।

বান্ধবী নাচে। বান্ধবীরা নাচে।

নদী বহতি। নদ্য: বহন্তি।

ভগিনী ধাবতি। ভগিন্য: ধাবন্তি।

তরুণী পশ্যতি। ....।

রমণী বদতি। ....।

দেবী হসতি। ....।

কিশোরী উপবিশতি। ....।

....। ....।

প্রয়োগং কুর্ম: –

স্বয়ং বাক্যানি রচয়ন্তু।

গচ্ছতি, আগচ্ছতি, পঠতি, লিখতি, পিবতি, বদতি, পশ্যতি।

ভালো কথা

ভিখারিণী ঠাকুমা

আমাদের পাশের পাড়ায় এক ভিখারিণী থাকে। মানুষের বাড়িতে গান গেয়ে ভিক্ষা করে। আমরা ঠাকুমা বলি। সব বাড়িতে যায় না। আমাদের পাড়ায় আমাদের বাড়ি আর সুমনাদের বাড়ি আসে। মাসে একবার করে আমাদের পাড়ায় আসে। সুমনার ঠাকুমা ওই ঠাকুমাকে বসিয়ে অনেক কটা গান শোনে। তারপর দুপুরে ওদের বাড়িতেই খেয়েদেয়ে বিকেলে নিজের ঘরে চলে যায়। সুমনার মা খুব আদর করে ওই ঠাকুমাকে খেতে দেয়। ওই ঠাকুমার গলা খুব ভালো। সব ভক্তিমূলক গান গায়। কোনো কোনোদিন আমি আর সুমানও বসে বসে শুনি। গান শুনতে শুনতে সুমনার ঠাকুমা কেঁদে ফেলে। তখন ওই ঠাকুমারও কাঁদতে কাঁদতে গাইতে থাকে।

শ্যামশ্রী পাল, সপ্তমশ্রেণী, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

কাক

সুজাতা সরদার, নবমশ্রেণী, ক্যানিং , দঃ ২৪ পরগনা।

ঠিক সময়ে আসে কাক
কা কা রবে দেয় যে হাঁক,
ঠাকুমা তখন হেঁটে টুক টুক
কাকের মুখে দেয় যে বিস্কুট।
ঠাকুমা সেদিন খুবই জ্বরে
কাকটি এসে কা কা করে,
ডাকতে থাকে করুণ স্বরে
খানি পরে যায় যে উড়ে।

পরদিনেতে আবার এসে
কা কা করে জানালায় বসে,
আমি তখন বিস্কুট এনে
দিতে গেলাম কাকের মুখে।
আমায় দেখে পালিয়ে গেল
ভাবলাম আমি, কী যে হলো,
চোখ পাকিয়ে বলল কাক,
আজ খাব না তোর হাতেই থাক।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

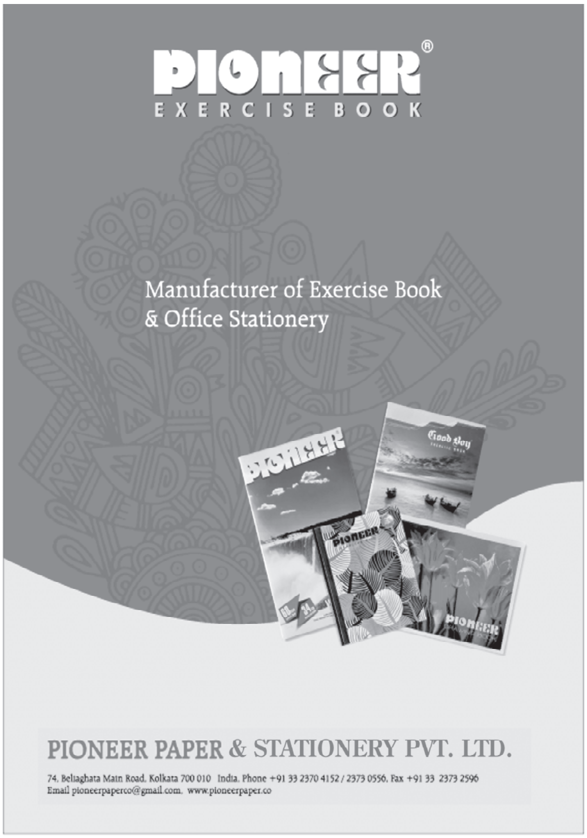

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT ☎ 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

এক উদ্বাস্তু বাঙ্গালির মনের ব্যথা

ওম প্রকাশ ঘোষ রায়

আমি একজন বাংলাদেশি উদ্বাস্তু। এই মর্মে পরমেশ্বরের নামে সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমি যাহা বলিব সত্য বই মিথ্যা বলিব না— আমার জন্ম হয়েছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতালগ্নে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসে পূর্ববঙ্গের না গ্রাম না শহর চট্টগ্রামের সদরঘাট মহল্লায়। আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম অপরিণত এক সাতমাসের শিশু রূপে। শুনেছি আমার নিঃসার অচৈতন্য ক্ষুদ্র মাংসপিণ্ডটাকে হাতের তালুতে তুলোর প্যাডে নিয়ে আমার বাবা প্রায় আড়াই বছর যাবৎ আমাদের পাড়ার ডাঃ জ্যোতিষ নন্দীর কাছে চিকিৎসার জন্য আনা নেওয়া করতেন। আর ডাঃ বাবুর আপ্রাণ চিকিৎসার দৌলতে আমার দেহে যখন প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল তখনও আমার কোনো নামকরণ করা হয়নি। এমনকী আমার ভুমিষ্ঠ হবার দিনক্ষণ, তারিখও একপ্রকার ভুলে গিয়ে আমার বেঁচে থাকার আশ্বাস পেয়ে ১৯৪৯ সালের ৭ অক্টোবর তারিখটাই জন্মদিন হিসেবে ধার্য করা হয়েছিল।

কাগজে-কলমে সকল নথিপত্রে উল্লেখ রয়েছে এ দিনটাই। যাকগে সেই জন্মদিনের কথা। এত কিছু বলার উদ্দেশ্য হলো, আমার প্রাণবায়ুর সাড়া পাওয়া শুরু থেকে বাল্য, কৈশোর, যৌবন এবং কর্মময় জীবনের কাল অবধি পূর্ববঙ্গ, পূর্ব পাকিস্তান, বাংলাদেশে অর্ধ জীবন কাটিয়ে এই ভারতবর্ষেই আমার ৭৮ বছর জীবনকালের চলমান সময় ক্ষেপণ। কিন্তু কখনো আমি বা আমার মা-বাবা, পরিবার পরিজন কখনো মাতৃভূমি ছেড়ে ভারতে উদ্বাস্তু হবার কথা ভাবতেই পারিনি। যদিও আমাদের বহু আত্মীয়স্বজন ভারতবাসী হয়েছে ইতোমধ্যে। যেহেতু আমার মা-বাবা ও পূর্বপরুষরা হিন্দু ছিলেন। অতএব আমিও হিন্দু। কিন্তু আমার জন্মস্থান হলো অবিভক্ত ভারত তথা পূর্ববঙ্গ পরে পূর্ব পাকিস্তান বর্তমানে ইসলামি বাংলাদেশ। যেখানে আমাদের বলা হতো ঢেঁডাইয়া, ডান্ডি, মালাউন, কাফের বলে। তবু আমি নিজেকে হিন্দু বলে গর্ব অনুভব করতাম। মুসলমানদের তথাকথিত নামকরণে একটু খারাপ লাগলেও তেমন গা করতাম না।

১৯৪৭, '৫০, '৫২, '৬৫, '৬৯, '৭০, '৯০, '৯১, '৯২ সাল অবধি দফায় দফায় জেহাদি আক্রমণে হিন্দু হত্যা, নির্যাতন, ধর্মান্তরণ, হিন্দু নারী ধর্ষণ, লুঠপাট সত্ত্বেও আমাদের ১৩ জনের পরিবারের সদস্যরা হিন্দু হয়েই বাংলাদেশের মাটি কামড়ে পড়েছিলাম। আর আমাদের বহু আত্মীয়স্বজন জেহাদি আক্রমণে নিহত, নির্যাতিত এবং প্রাণ বাঁচাতে ধর্মান্তরিত হয়েছে এবং ভিটে মাটি হারিয়েছে। কিন্তু সেইসব নব্য মুসলমানরা কী শিক্ষিত, কী অশিক্ষিত নিজেদের পরিবার পরিজনকে রক্ষা করতে পারেনি। মুসলমানরা একজন হিন্দুকে ছলে-বলে-কৌশলে গোমাংস খাওয়াতে পারলেই জাতধর্ম নষ্ট করতে পারার আনন্দে উল্লসিত হয়ে ঢাকঢোল পিটাতে কার্পণ্য করে না। শুধু কী তাই, একজন হিন্দু যদি কোনো মুসলমান মেয়ের প্রেমে পড়ে বিয়ে করে তবে তার রেহাই নেই। সেই নবদম্পতিকে অবশ্যই মুসলমান হতে হতো। এমনকী তার পুরো পরিবারকে খেসারত দিতে হতো।

অপর দিকে কোনো মুসলমান যুবক যদি হিন্দু মেয়েকে ফুসলিয়ে কিংবা প্রতারণা করে লোভে ফেলে অথবা জোরজুলুম করে বিয়ে করে তবে তো সে ইসলামে ধর্মান্তরিত হতোই

ফঃ ৬

আর মেয়েটি হতো ভোগের বস্তু। এক্ষেত্রে মুসলমান ছেলেটা আবারও ৩টা বিয়ে করে নিত। শরিয়ত মতে যেহেতু ৪টি বিয়ে করতে বাধা ছিল না। এক্ষেত্রে হিন্দু মেয়েটার পরিবারকেও সহায় সম্পত্তি হারাতে হতো কিংবা দেশান্তরি হতে বাধ্য হতো। শুধুমাত্র দুটো ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। 'বাংলার বিবেক' চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি তথা বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী আবুল ফজলের পুত্র অধ্যাপক আবুল মোমেন আমার স্কুল জীবনের সঙ্গী। সে প্রেমে অন্ধ হয়ে চট্টগ্রামের বিশিষ্ট আইনজীবীর একমাত্র মেয়ে শীলা দাশকে বিয়ে করে। কথা ছিল স্ব-স্ব ধর্ম পালনে কেউ কারও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে না। কিন্তু সেই 'বাংলার বিবেক' আবুল ফজলসাহেব কাফেরের মেয়েকে পুত্রবধূ হিসেবে মেনে তো নিলেন না বরং একটা শর্তে মান্যতা দেন যদি শিক্ষিকা শীলা ধর্মান্তরিত হয়ে পর্দানশিন গৃহবধূ হিসেবে আসতে পারে তবেই পুত্রবধূ হিসেবে গ্রহণ করবেন। অবশেষে শীলাকে তাই করতে বাধ্য করা হলো।

তেমনিভাবে আর একজন বাংলাদেশের প্রখ্যাত কবি মহাদেব সাহার পুত্রের প্রেমে পড়ে এক মুসলমান মেয়ে মহাদেব সাহার সংসারে ঠাঁই হলে শুরু হয় ঢাকার স্থানীয় মুসলমানদের জেহাদ। সাহা পরিবার জেহাদিদের হামলার শিকারে অত্যাচারিত হলে মহাদেব সাহা তারই সুপরিচিত ও ঘনিষ্ঠজন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! প্রধানমন্ত্রী কোনো সাড়াতো দিলোই না, হলো উলটো বিচার। কত বড়ো সাহস বেটা মালাউনের বাচ্চার, মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করার ধৃষ্টতা দেখায়! অতপর মহাদেব সাহার ছেলে এবং তার পরিবার ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হলো। এইতো সামান্য দু'টো ঘটনা। কত শত হিন্দু পরিবারের এমন ঘটনা ঘটে চলেছে তা বর্ণনাতীত। সত্যিই তো ভাবতেই অবাক লাগে যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমার সোনার বাংলার আজ কী হাল। উল্লেখ্য যে, যেখানে মানবতাবাদী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো ব্যক্তিত্ব মুসলমানদের সম্পর্কে হিন্দুদের সচেতন করে গেছেন সেখানে আজকের সারা বিশ্বে হিন্দুরা মুসলমান জেহাদিদের বলির পাঁঠা হয়েও কীভাবে উচ্চারণ করতে পারে— 'হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই'। একি লজ্জা। এ লজ্জা রাখার কোনো জায়গা নেই।

আমার যখন ৪০ বছর বয়স ছুঁই ছুঁই, তখন আমার বৃদ্ধ বাবা হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত নিলেন আমরা পরিবারের সকলে বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে চলে যাব। তিনি বললেন আর দেরি করা নয় এদেশ নাকি হিন্দুদের নয়। এখানে থাকলে হয় মুসলমান হতে হবে নয়তো জেহাদিদের হাতে কোতল হতে হবে। যেমনি ভাবা তেমনি ব্যবস্থা হলো। অতপর আমরা পশ্চিমবঙ্গে চলে এলাম। বাংলাদেশে পৈতৃক সম্পত্তি আর আমার শিক্ষকতা পেশায় এক যুগের বেশি চলমান সময়কালে কলকাতায় এসে অচেনা পরিমণ্ডলে হাবুডবু খেতে লাগলাম। নেই চাকরি, নেই বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন। আমি পরিব্রাজক হয়ে সারা ভারতবর্ষের হিন্দুতীর্থ আর মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। আর সেসব ভ্রমণ বৃত্তান্ত লেখালেখি করে বেঁচে থাকার পথ খুঁজে নিলাম। ভারতে এসে দেখলাম এক বিচিত্র সমাজ ব্যবস্থা। হিন্দুস্থান নামেই, শুধুমাত্র হিন্দুদের ভারতমাতার নামাঙ্কিত ভারতবর্ষ, যা হলো সেকুলারবাদী, বামপন্থী, যত মত তত পথ ধারীদের রমরমা কাজকারবারের ক্ষেত্র।

অথচ ১৯৪৭ সালে দেশটা ভাগ হয়েছিল দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে। মুসলমানরা তাদের প্রাপ্য অংশের চাইতে বেশি অংশ নিয়ে পাকিস্তান আর বাংলাদেশকেও ইসলামি দেশ হিসেবে তৈরি করেছে। শুধু তাই নয়, ভারতে বসবাসকারী মুসলমানরা ভারত ছেড়ে যায়নি। অপরদিকে দিকে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের হিন্দুরা মা-বোনের ইজ্জত বিসর্জন দিয়ে সহায় সম্পদ হারিয়ে ভারতে উদ্বাস্তু হয়ে ভাগ্যহীনভাবে তিলে তিলে ধুঁকে মরছে। হিন্দু শরণার্থীরা ১৯৪৭ সাল থেকে আন্দামানে, দণ্ডকারণ্যে, পাহাড়ে-পর্বতে, জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছে আর বামেদের রাজত্বে মরিচঝাঁপিতে হাজার হাজার হিন্দু উদ্বাস্তু কমিউনিস্ট পার্টির দলদাস পুলিশের গুলিতে ও আগুনে পুড়িয়ে যেমন মেরেছে, তেমনি রোগে-শোকে-অনাহারে নিরাশ্রিত হয়ে তিলে তিলে ধুঁকে ধুকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, কে তার হিসাব রেখেছে। অথচ এই জ্যোতি বসুও সপরিবারে বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে এসেছেন।

পশ্চিমবঙ্গে শাসকদলগুলি ভোটের লোভে গদি দখলে শরণার্থী হিন্দুদের খেলার পুতুল হিসেবে ব্যবহার করেছে। তাদের নাকের ডগায় 'সিটিজেনশিপ' নামক দলিলের গাজর মুলো ঝুলিয়ে রেখে দমিয়ে রেখেছে। যে দলই গদি পেয়েছে ভোটব্যাংকের স্বার্থে মুসলমানদের তোষণ করে মাথায় তুলেছে। আর বোকা হিন্দুরা বলির পাঁঠা হয়েছে। কংগ্রেসের কারণেই তৈরি হয়েছে মুসলমানদের পাকিস্তান এই ভারতের রাজ্য কাশ্মীরের হিন্দু পণ্ডিতরা উদ্বাস্তু হয়েছে। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা প্রয়োগ হয়েছে। ৪৪ লক্ষ একর জমি, ৫৬৫টি ক্ষুদ্র রাজ্য, ৪৩টি দুর্গ, ১৮৭০০টি ছোটো দুর্গ রাজপুতরা দেশের জন্য উৎসর্গ করেছিল। কংগ্রেসের অনুগ্রহে সেই সব কিছুর মালিক হয়েছে মুসলিম ওয়াকফ বোর্ড। মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডও তৈরি হয়েছিল মুসলমানদের স্বার্থে। (সূত্র : লেখক গোষ্ঠীর বার্তা)

কংগ্রেস এসব করেছে শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্যে। আসলে কংগ্রেস আগে থেকেই গাজওয়া-ই-হিন্দ-এর প্রস্তুতি নিয়েছিল ইসলামিক দেশ তৈরির পরিকল্পনা করেই আর হিন্দুদের শুধুমাত্র সংরক্ষণ দেওয়া হয়েছিল যাতে হিন্দু সমাজ নিজেদের মধ্যে লড়াই করতে থাকে, যেন গাজওয়া-ই-হিন্দ-এর ষড়যন্ত্র কখনো বুঝতে না পারে। বোকা হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও মুসলমানদের জনসংখ্যার চাইতে বেশি জায়গা দিয়েও নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য কিছু ভাবতে শিখেনি। এমনকী কাশ্মীরের অর্ধেক অংশ যা হলো 'পিওকে' পাকিস্তানকে ছেড়ে দিতে হয়েছে। এইসব ষড়যন্ত্র ছিল কংগ্রেসের সরকারের যা আজ জঙ্গিদের দাপটে গোদের উপর বিষফোঁড়া হয়ে উঠেছে। আবার হিন্দু মনীষী, সাধুসন্তরা কিংবা তথাকথিত হিন্দু নেতারা কখনো জানতে চেষ্টা করেনি ইসলাম কী? তারা কখনো কোরান শরীফ পড়েনি। অনুরোধ রইল তাঁরা যেন

কোরানটা অন্তত পড়ে দেখেন।

হাজার হাজার হিন্দু শরণার্থীর ওপর জ্যোতি বসুর লেলিয়ে দেওয়া সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর গুলিতে প্রাণ দিয়েছে। কোরানেই তো বলা হয়েছে, 'যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যায় তখন ওই মুশারিকদেরকে যেখানে পাও হত্যা করো...। যদি তারা তওবা করে নেয়, নামাজ আদায় করে এবং যাকাত দেয় তাদের ছেড়ে দাও...' (কোরান, ৯ : ৫)। '(...যে ব্যক্তি আল্লার নাখিলকৃত বিধান অনুযায়ী হুকুম প্রদান না করে (বিধান না দেয়) তাহলে এমন লোকতো কাফির' (কোরান : ৫ : ৪৪) 'নিশ্চয়' ইসলামই আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম...(কোরান : ৩ : ১৯)। 'পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য হতে কোনো গৃহবাসীকে ছেড়ে দেবেন না...' যদি তাদেরকে ছেড়ে দেন তারা আপনার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং যারা জন্মলাভ করবে তারা হবে দুষ্কৃতকারী ও কাফির 'কোরান : ৭১ : ২৬, ২৭)।

তাই ইসলামি জেহাদিরা হিন্দুদের মেরে কেটে এই ভারতবর্ষকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করতে উঠে পড়ে লেগেছে। বসিরহাট, ক্যানিং, মহেশতলা, দেগঙ্গা, হাওড়া, মালদহ, নদীয়া, বনগাঁ, কলকাতায় মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় শাসক গোষ্ঠীর প্ররোচনায় বহু হিন্দু পরিবার জেহাদি মুসলমান কর্তৃক অত্যাচারিত, নিপীড়িত হয়ে ধনসম্পদ হারিয়ে গৃহচ্যুত হয়েছে। আবার সন্দেশখালিতেই হিন্দুদের ধনসম্পদ লুট করেছে। বেছে বেছে হিন্দু মা-বোনেদের ইজ্জত লুটে নিয়েছে এবং হিন্দুপুরুষদের হত্যা করে মাছের খাবার করেছে। শাসকদলের মদতপুষ্ট জেহাদি শেখ শাজাহানের দলের জেহাদিরা। তাছাড়া এই অতি সম্প্রতি ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে শাসক গোষ্ঠীর মদতে ওয়াকফ সংশোধনী আইন বাতিলের নামে জেহাদি মুসলমানরা মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ, সুতি, জাফরাবাদ, জঙ্গীপুর গ্রামে বেছে বেছে শুধুমাত্র হিন্দু পরিবারের উপর হামলা চালিয়েছে। জেহাদি মুসলমানরা স্থানীয় শাসক দলের নেতাদের উসকানিতে পুলিশ বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তায় তাণ্ডবলীলা চালিয়ে হিন্দুদের ঘরবাড়ি ভাঙচুর করে লুটপাট করে আগুন লাগিয়ে দিয়ে হিন্দুদের বাস্তুহারা করেছে। হিন্দুরা পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েও কোনো সহায়তা পায়নি। এমনকী কালিকামাতা শীতলামাতা, শিবের মন্দিরও রেহাই পায়নি।

আবার হিন্দু পিতা-পুত্রকে কুপিয়ে টুকরো টুকরো করে হত্যা করেছে জেহাদিরা। এইরকম নৃশংস হিংসাত্মক ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গের শাসক নির্বিকার রয়েছে শুধুমাত্র মুসলমানদের তোষণ ও ভোটব্যাংকের স্বার্থে। হাইকোর্টের এবং জাতীয় মহিলা কমিশনের তত্ত্বাবধানে তদন্তকারী দলের রিপোর্টে জানা গেছে এই নৃশংস হত্যা ও ধ্বংসাত্মক কাজের হোতা হচ্ছে রাজ্য শাসক দলের স্থানীয় মুসলমান নেতারা তাদের দ্বারা পরিকল্পিতভাবে শুধুমাত্র হিন্দুদের উপর আক্রমণ হয়েছে। হিন্দুদের এই দুরবস্থা আজ এই স্বাধীন ভারতে দেখতে হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের কাটছে মারছে মুসলমান জেহাদিদেরাই। এইতো সেদিন ২২ এপ্রিল '২৫ পাকিস্তানি জঙ্গি লস্কর বাহিনীর সদস্যরা কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে শুধুমাত্র হিন্দু হওয়ার অপরাধে ২৬ জন ভারতীয়কে গুলি করে হত্যা করেছে। এখানেও হিন্দুরা মরছে আর মারছে মুসলমানরাই।

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ এবং কাশ্মীরের হিন্দুদের স্বদেশে পরবাসী হওয়ার মধ্যে একটা অলিখিত যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। ভারতে অবস্থানরত মুসলমানরা প্রতিবেশী দেশ এবং বিশ্বের ইসলামি দেশসমূহের জেহাদি মুসলমানদের সহযোগিতায় শুধুমাত্র হিন্দুদের মেরে কেটে তাড়িয়ে দিয়ে ভারতকে হিন্দুশূন্য করে দার-উল-ইসলামে পরিণত করতে এগিয়ে চলেছে। এবং তাতে ইন্ধন জোগাচ্ছে গদিলোভী, সেকুলার রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা বাংলাদেশ, পাকস্তান থেকে আসা অনুপ্রবেশকারী অহিন্দুদের সহযোগিতায়। তবে আশার আলো দেখা যাচ্ছে বর্তমান ভারতের কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার পাকিস্তানি জঙ্গিদের পহেলগাঁওয়ে ২৬ জন হিন্দু হত্যার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীজীর নির্দেশে 'অপারেশন সিঁদুর' নামে গত ৭ মে থেকে প্রত্যাঘাত হেনেছে ভারতীয় বিমান, নৌ এবং স্থল বাহিনীর জোয়ানরা। এই তিন সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে পাকিস্তানের মূল ভূখণ্ডে আঘাত হেনে পাক আশ্রিত জঙ্গিদের ৯টি ঘাঁটি এবং ১১টি এয়ার বেস, ৫টি যুদ্ধবিমান ও বহু ড্রোন ধ্বংস করে দিয়েছে। এমনকী আমাদের সেনারা পাকিস্তানের কোনো সাধারণ মানুষের ক্ষতিসাধন কিংবা মৃত্যু ঘটায়নি। শুধুমাত্র জঙ্গিদের নিকেশ করেছে। পরবর্তী সময়ে 'অপারেশন মহাদেব'-এর মাধ্যমে কাশ্মীরে লুকিয়ে থাকা পহেলগাঁওয়ের নির্মমভাবে হিন্দু পর্যটকদের হত্যাকাণ্ডের হোতা জঙ্গিদের গভীর জঙ্গলে ঘেরাও করে হত্যা করেছে।

সঙ্গে মোদীজীর কথায় 'রক্ত আর জল' একই খাতে প্রবাহিত হতে পারে না। তাই পাকিস্তানের সঙ্গে সিন্ধুনদীর জল চুক্তি বাতিল করে সিন্ধু নদীর জল বন্ধ করে দিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে সকল ব্যবসা বাণিজ্য এবং বিমান চলাচল বন্ধ করেও দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া পাকিস্তনের সহযোগী বাংলাদেশের জেহাদি অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান ইউনুসের সঙ্গেও সকল ব্যবসা বাণিজ্য ও বর্ডার সিল করে দিয়ে স্থলপথে যাতায়াতের ব্যবস্থাও বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু জেহাদি পাকিস্তান আবারও বাংলাদেশকে লেলিয়ে দিয়ে ভারতের উত্তর-পূর্বের সেভেন সিস্টার্স রাজ্যসমূহকে আক্রমণ করার কথা বলে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছে। শুধু নয়, পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর, দিনাজপুর, শিলিগুড়ি-সহ উত্তরবঙ্গ তথা কলকাতা-সহ বর্ডার সংলগ্ন জেলা গুলিতে মুসলমানদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে এই পশ্চিমবঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে।

তবে ভারত সরকারও প্রস্তুত রয়েছে তাদের সকল দুরভিসন্ধি নস্যাৎ করে দিয়ে যোগ্য জবাব দিতে। এখানে একটি কথা বলতে হচ্ছে, প্রথমেই ধ্বংস করতে হবে ১৪০ কোটি জনতার মধ্যে যারা ভারতের খেয়ে-পরে ভারতের বিরুদ্ধাচরণ করছে সেই সব মীরজাফরদের এবং অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি, পাকিস্তানি, ইসলামি জেহাদি জঙ্গি ও রোহিঙ্গাদেরকে ভারতভূমি থেকে

সম্পূর্ণভাবে বিতাড়ন করা। আর এজন্যে হিন্দুদের একতাবদ্ধ হবার সময় এসে গেছে। কেননা পশ্চিমবঙ্গ অচিরেই মুসলমানরা যে গ্রাস করে নেবে তার সংকেত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় বারাসাত- ব্যারাকপুরের পরে হিন্দু দেখাই যায় না। পশ্চিমে সাঁতরাগাছি-হাওড়া ব্রিজের ওপার হিন্দুশূন্য হয়ে গেছে। দক্ষিণপূর্বে গড়িয়া থেকে সায়েন্সসিটির বাইপাশের পূর্বদিকেও তথৈবচ অবস্থা। আর বৃহত্তর কলকাতার শিয়ালদহ, মৌলালি, রাজাবাজার, পার্কসার্কাস, তপসিয়া, তিলজলা, খিদিরপুর, মোমিনপুর, ঠাকুরপুকুর, মহেশতলা, মেটিয়াবুরুজ, একবালপুর, নুঙ্গী, বাটা, হরিদেবপুর, বাদু তো প্রায় হিন্দুশূন্য হয়ে গেছে। অর্থাৎ এককথায় পুরো কলকাতাই মুসলমানরা গ্রাস করে ফেলেছে।

এখন পশ্চিমবঙ্গের আর কিই-বা বাকি রইল। যার নমুনা দেখতে পাবেন মুসলমানদের ঈদুল আজহা, ঈদুল ফিতর, শবেবরাত, মহরমে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে রাস্তাঘাট, মাঠ, ময়দান দখল করতে দেখা যায়। আর পশ্চিমবঙ্গের নেতা-নেত্রীরা তাদের তোষণ করতে হিজাব আর টুপি পরে ইফতারি করতে ও নামাজ পড়ার ধুম লেগে যায় শুধুমাত্র ভোটব্যাংকের লক্ষ্যে। আর বোকা হিন্দুরা চোখ থাকতেও অন্ধের ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছে। অথচ ভারতভূমি হলো ৮০ কোটি হিন্দুর মাতৃভূমি। কেননা ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভাগ হয়েছিল। পাকিস্তান হবে মুসলমানদের জন্য আর ভারত অর্থাৎ হিন্দুস্থান হবে হিন্দুদের দেশ। অথচ ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হয়ে ভারতের মুসলমনরা রয়ে গেল ভারতেই। দুই দেশের মধ্যে হিন্দু মুসলমান জনসংখ্যা বিনিময় তো হলোই না, অধিকিন্তু স্বাধীনোত্তর সময়ে কংগ্রেস শাসনে বামপন্থীদের সহযোগিতায় মুসলমানরা জাঁকিয়ে বসলো ভারতের বুকে।

যার ফলে আজ অবধি সেকুলারবাদী-বাম, কংগ্রেসি নেতাদের তোষণের রাজনীতির দাবার চালে হিন্দুস্থানের লেজেগোবরে অবস্থা। জানিনা এর শেষ কোথায়? আবার কী এই ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুর সংখ্যা কমে গিয়ে ভারতভূমি ছেড়ে অন্য কোথাও উদ্বাস্তু হতে হবে, নাকি জেহাদি মুসলমানদের তরবারীর নীচে কোতল হতে হবে। কেউ কি তার উত্তর দিতে পারবেন? অপেক্ষায় রইলাম। কখন এই গ্রহণকাল শেষ হবে। আকাশে বাতাসে রণিত হবে 'ভারতমাতা কী জয়।' 'জয় শ্রীরাম'। জয় মাকালী, জয় মা দুর্গা। পরিতাপের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আজ পর্যন্ত হাজার হাজার হিন্দু উদ্বাস্তু ভারতীয় নাগরিকত্বের অধিকার অর্জন করতে পারেনি। অথচ তাদের মধ্যে বহু ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উচ্চ শিক্ষিত ডিগ্রিধারীও রয়েছেন। তারা সরকারি চাকুরিতে কর্মপ্রাপ্তির জন্যে যোগ্যতা প্রদর্শন করতে পারছে না। শুধুমাত্র ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড নিয়ে ভারতবর্ষে লুকোচুরি করে বেঁচে রয়েছে। এই সকল পরিচিতির দলিলপত্রের কোনোটিই নাকি প্রকৃত ভারতীয়ের নাগরিকত্বের সনদ নয়। শুধুমাত্র স্ব স্ব ব্যক্তি পরিচিতি বিশেষ মাত্র।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে হিন্দুরা কত অসচেতন জাতি যে, গণতন্ত্রের মূল্যবোধ সম্পর্কে তারা মর্যাদাবান তো নয়ই। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, হিন্দুরা ভোট দেয় মুসলমানের অনুপাতে ৩০ শতাংশ। এভাবেই কী সংখ্যাগুরু হিন্দুরা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতে সমর্থ হবে? তাহলে তো খণ্ডিত ভারতও হিন্দুদের হাতছাড়া হতে খুব একটা দেরি হবে না। ভবিষ্যতে আর কিন্তু বিন কাশেম, সুলতান মাহমুদ, বাবর, তাতার, তৈমুরলঙ, মহম্মদ ঘোরি, নাদির শাহ, শাহ আবদালি, চেঙ্গিজ খান, আদিল শাহ, টিপু সুলতান, হুমায়ুন, জাফর জঙ্গ ইব্রাহিম লোদি, আওরঙ্গজেব, শাহজাহান, তুঘলক, মীরজুমলা ফিরোজ শাহ, হায়দার আলি, শক্, হুন, পাঠান আর তাদের সহযোগী ইসলাম প্রচারক সুফির দল, মেরে কেটে ধর্মান্তরিত করে ইসলামের বংশবৃদ্ধি করতে আসবে না— আসবে না বেনিয়ার ছদ্মবেশে ইংরেজরা। আসবে ভারতের মধ্যে ফুলেফেঁপে ওঠা মুসলমান জেহাদি বাহিনী। তারা বংশবিস্তার করে ভারতবর্ষকে হয়তো আগামীদিনে গিলে খেতে চলেছে। আর আসবে ইংরেজদের রেখে যাওয়া তাদের দালালরা। তাদের ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা ভারতবিরোধী তথা হিন্দু বিরোধীদের সমূলে বিনাশ করতে হবে।

তাই সনাতন ধর্মের ভাই-বোনেদের তো ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। একতাই শক্তি। সময় এসে গেছে ভারত ধ্বংসকারী রক্তবীজদের বিনাশ করার কাল। আর কালক্ষেপণ নয়, জাগো হিন্দু। বজ্রনির্ঘোষে বলতে হবে জয় শ্রীরাম, জয় মা কালী, জয় মা দুর্গা। □

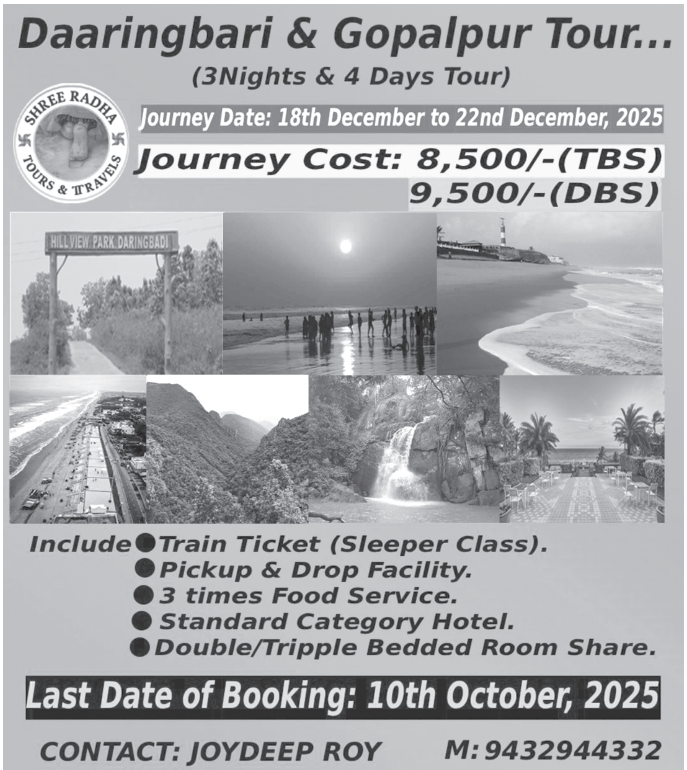

রাজ্যের শাসক দলের মরণ-বাঁচন লুকিয়ে 'জীবনের' কাছেই

বিশ্বপ্রিয় দাস

নিজের পাতা জালে নিজেই ফাঁসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। আর তিনি ফাঁসছেন তার পার্ষদদের জন্য। তিনি আর নিজেকে সততার প্রতিমূর্তি বলতে পারছেন, নাকি তিনি নিজে মেনে নিতে পারছেন সব? এই প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসছে সাধারণের মনে। তাঁর টাকা তোলার জন্য তোলাবাজ বিধায়ক, জীবনকৃষ্ণ সাহা, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, রেশনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকরা যা ঘটিয়েছেন, সেটা তাঁর মাথার মুকুটে এক একটি পালক হয়ে জুড়ে গেছে। ছোটো-বড়ো নেতাদের কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল। তিনি ও তাঁর সরকার এতটাই জীবনকৃষ্ণ সাহার বিষয়ে দুর্বল যে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা দূরে থাক, তাঁর সপক্ষে তাঁর দলের মুখপাত্ররা দিনের পর দিন নানা কথা সংবাদ মাধ্যমে সাফাই গেয়েই চলেছেন। কী যুক্তি দেখাচ্ছেন? ভোট এলেই ইডি, সিবিআই-এর তৎপরতা বাড়ে। তাঁরা জীবনের পক্ষে বলতে গিয়ে গিয়ে বলছেন যে তাকে তো সিবিআই গ্রেপ্তার করেছিল, সেই সময়ে তদন্ত করতে পারল না?

এখন আবার তাকে আটক করার কী আছে? তাঁরা জীবন সাহার জামিন পাওয়া প্রসঙ্গও টেনে আনছেন। আইন বলছে, জামিন পাওয়ার অর্থ দোষ মুক্ত নয়। জীবন সাহা বেরিয়ে এসেও শোধরানো মাথায় থাক, আবারো পূর্ণ উদ্যমে নেমে পড়েছিল পুরোনো পেশায়, সেই চাকরি করে দেওয়ার জন্য টাকা নেওয়া। আর যারা টাকা দিয়ে চাকরি পাননি, টাকা ফেরত চেয়ে ফোন করেছেন। তাকে হুমকি দেওয়ার খবর বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ্যে এসেছে। এরপর ইডি আরও তথ্য প্রমাণ জোগাড় করেই না তাঁর বাড়িতে হানা দিয়েছে?

তিনি যদি দোষী না হবেন, তাহলে সেই আগের পদ্ধতিতে মোবাইল ফোন ছুড়ে ফেলে দেবেন কেন? কেনই-বা ছিঁচকে চোরের মতো পালাতে যাবেন? প্রাথমিকভাবে সাধারণের মনে এই প্রশ্ন আসছে, যে টাকা তিনি তুলেছেন কিন্তু সেই টাকা কার জন্য তুলেছেন? তাঁর বিপুল সম্পত্তি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তার বাবা। নগদ টাকা তিনি কোথায়, কার কাছে পাঠিয়েছেন, সেই প্রশ্নের মুখোমুখিও হতে হয়েছে বাবাকে। এদিকে তাঁর কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে এক শাসক দলের কাউন্সিলরের নাম, সম্পর্কে তিনি আবার জীবন সাহার নিজের পিসি। এখানেও রাজনৈতিক মহলে আবার চর্চার কেন্দ্রে চলে এসেছে পিসি-ভাইপোর কথা।

একটি সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে যে এবারে জীবন সাহাকে এমন ভাবে বেঁধেছে ইডি। সেই ফাঁস কেটে বেরোনো যে কত কঠিন, সেটা টের পাবেন কিছুদিন পর। ওই সূত্রটি আরও জানাচ্ছে যে, এবার কানের টানে মাথাও চলে আসতে পারে। তাঁর কারণ হিসেবে ওই সূত্র বলছে, সিবিআই বা ইডি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে যে একটা বাজে ধারণার সৃষ্টি হয়েছে, সেখান থেকে বেরোবার চেষ্টা করবে কেন্দ্রীয় এই তদন্তকারী সংস্থা। এখানে ভুললে চলবে না, তদন্তের জটিলতার ওপর নির্ভর করে সমাধানের সময়। আর পারিপার্শ্বিক তথ্য প্রমাণ জোগাড় করতেই সময় লাগতে পারে অনেক। তবে এর পিছনে একটি উলটো বিষয়ও আছে, তদন্ত যত দীর্ঘায়িত হবে, তথ্য প্রমাণ পেতে ততই সমস্যা বাড়ে। ওই সূত্রটি বলছে, এবার নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে যে তদন্ত এগিয়েছে, সেটা হয়তো সমাধানের দিকে অনেকটাই এগিয়ে যাবে। আর সমস্যা বাড়বে শাসক দলের। হয়তো-বা ২০২৬-এর রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচনের আগেই সেই সমাধানের বোমা ফাটবে। সেই বিস্ফোরণের ধাক্কা সামলাতে পারবে তো রাজ্যের শাসক দল? রাজ্যের শাসক দলের সুপ্রিমো হয়তো গলা ফাটিয়ে, নানা মিথ্যাচারে মানুষের মনকে বেসামাল করে দিতে চাইছেন। কিন্তু সেখানেও দলের ভিতরে বহু সৎ কর্মী আছেন, যারা সাম্প্রতিক ঘটনা বা দুর্নীতিকে মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না। তাঁরা দলকে ভালোবেসে এখনো দলে রয়ে গেছেন, তাঁরা সেই ভালোবাসার তাগিদে দল বদল করতে পারছেন না। অনেক নীচুতলার কর্মীরা বসে গেছেন। ফলে অনেক কর্মী-সভাতেই নেতাদের বলতে হচ্ছে এক হয়ে কাজ করতে। দলের ভিতরে দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠে ২০২৬-কে পাখির চোখ করে ঝাঁপিয়ে পড়তে। এদিকে বেশ কিছু নীচুতলার কর্মী অনেক কিছুই মেনে নিতে পারছেন না যেমন কপর্দকহীন থেকে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক হয়ে ওঠা নেতাদের দাদাগিরি।

রাজ্যের শাসক দলের যে বেসামাল অবস্থা, সেটা এখন মুখপাত্রদের নানা বিবৃতিতে যেমন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তেমনি দলের যে কোনো নিয়ন্ত্রণ বা মুখপাত্ররা কী বলবেন, সেই গাইড লাইন বেঁধে দেওয়ার মতো কেউ নেই, সেটা বারে বারেই দেখা যাচ্ছে। সমানে মুখপাত্র হিসেবে বেশ কয়েকজন আসেন নানা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে। তাঁরা মূলত ঝগড়া করতে আসেন। একেবারেই রাজনৈতিক পড়াশোনার ধার পাশ দিয়ে যান না। কেউ রাজনৈতিক আক্রমণ করলে, সেই আক্রমণকে প্রতিহত করার ক্ষমতা এই সব মুখপাত্রদের নেই। এরা সঙ্গে সঙ্গে অন্য যুক্তিতে চলে যান। একই তথ্যের চর্বিতচর্বণ করেন সবাই। রাজনৈতিক আক্রমণ করতে গেলে যুক্তির ধার থাকতে হয়, আর সেটা করতে গেলে যে রাজনৈতিক জ্ঞানের দরকার, সেটার অভাব যে রয়েছে, সেটা স্পষ্ট হয়ে যায়। বিধায়ক জীবন সাহার ঘটনায় সেটা আবারো প্রমাণিত।

এর আগে অনুব্রতের বেলায়ও ঘটেছে। এসআইআর নিয়ে যে সব কথা তাঁরা বলছেন, যারা একটু হলেও বিষয়টি জানেন, তাঁরা ছি ছি করছেন। সম্প্রতি বৈদ্যুতিন মাধ্যমের একটি অনুষ্ঠানে সাংবাদিক কুলোশিরোমণি এক মুখপাত্র, বিজেপির এক বক্তাকে দলুবদলু বলে বারে বারে বিব্রত করার চেষ্টা করলেন। আচ্ছা তিনি যে সুপ্রিমোর মতো সবজান্তা, সব বিষয়ে বলতে পারেন, অবলীলায় সেভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন আর উলটোদিকে যে দর্শক থাকেন, তাঁরা তাকে দেখে একটি কমেডি চরিত্র ভেবে মজা পান। সুপ্রিমো কী কারণে এঁদের হাতে দলের হয়ে কথা বলার দায়িত্ব দিয়ে রেখেছেন, সেটা ভগবান জানেন। □

মহুয়া মৈত্রর বিতর্কিত মন্তব্য ভারতের গণতান্ত্রিক মান-মর্যাদার বিরোধী

বিপ্লব বিকাশ

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি দীর্ঘদিন ধরেই উত্তপ্ত। সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ মহুয়া মৈত্র এমন একটি মন্তব্য করেছেন, যা রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোড়ন তুলেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, '....প্রথমে তো অমিত শা-র মাথাটা কেটে প্রধানমন্ত্রীর টেবিলে রাখা উচিত।' এই বক্তব্য কেবল বিতর্কিত নয়, বরং অনেকের কাছে তা হিংসা এবং ঘৃণা ছড়ানোর ইঙ্গিত হিসেবে ধরা পড়েছে। বহুদলীয় গণতন্ত্রে মতবিরোধ থাকতেই পারে, কিন্তু ভিন্নমতের পরিসরটি যখন হিংসা ছড়ানো এবং ভীতি প্রদর্শনে ভরে যায়, তখন সেটি গোটা সমাজের জন্য ক্ষতিকর হয়ে ওঠে।

এই প্রেক্ষাপটে ফের আলোচনায় উঠে আসে চলচ্চিত্র পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রীর মন্তব্য। কয়েকদিন আগে তিনি দাবি করেছিলেন যে, তৃণমূল আসলে গুন্ডাদের দ্বারা চালিত।

অনেকেই ভেবেছিলেন যে, নানা ঘটনাকে তিনি অতিরঞ্জিত করছেন। কিন্তু যখন তাঁর ছবির ট্রেলার প্রদর্শনীর সময় জবরদস্তি স্ক্রিনিং বন্ধ করানোর ঘটনা ঘটে, এমনকী পুলিশও ছবির প্রচারের কাজে তাঁদের বাধা দেয়, তখন কিন্তু বিবেক অগ্নিহোত্রীর অভিযোগগুলি অমূলক মনে হয়নি। বিবেক অগ্নিহোত্রী যখন তাঁর তৈরি 'বুদ্ধ ইন এ ট্রাফিক জ্যাম' সিনেমাটির স্ক্রিনিং করতে এসেছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে, তখন তিনি এবং তাঁর টিমকে সেখানেও বাধা ও আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়। এই ঘটনাগুলির মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শাসকের সমালোচনার জায়গাটি এ রাজ্যে ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। ভয়াবহ হয়ে উঠছে রাজ্যের বাস্তব পরিস্থিতি।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকদের ওপর শাসক দলের পক্ষ থেকে হিংসা ও সন্ত্রাসের বিষয়টি দেশজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সেই সময় বিরোধী দলের বহু কর্মীকে হত্যা করা হয়। অসংখ্য মানুষ শাসক দলের হাতে নির্যাতিত হন এবং কয়েক হাজার পরিবার ঘরছাড়া হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়, একাধিক ব্যক্তিকে হত্যা, ধর্ষণ এবং নারীদের ওপর চরম নির্যাতনের ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে ঘটেছে। এ ধরনের ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ফৌজদারি মামলাগুলি সিবিআই-এর হাতে তুলে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসনের ওপর আক্রান্তদের এমনকী বিচারবিভাগেরও কোনোরকম আস্থা ছিল না। ইতিমধ্যে ২০২১-এর নির্বাচন পরবর্তী হিংসার সিবিআই তদন্তে একটি ঘটনায় যাবজ্জীবন সাজা ঘোষিত হয়েছে। এই বিষয়টি প্রমাণ করে যে পশ্চিমবঙ্গে ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস কোনো গুজব ছিল না। কিন্তু মানুষের মনে প্রশ্ন থেকে যায় যে, যত নিরপরাধ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে, সেসবের ঘটনায় দায়ীরা সবাই কি কখনও সত্যিই শাস্তি পাবে?

রাজনৈতিকভাবে বিরোধীদের সভা ভাঙচুর, মিটিং-মিছিলের ওপর হামলা, ধর্মীয় শোভাযাত্রা ঘিরে হিংসার ঘটনা এখন আর পশ্চিমবঙ্গে বিরল নয়। এর ফলে বিরোধী দলের কর্মী-সমর্থকরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, আর সাধারণ মানুষও ভয় এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে বাস করে।

এই পরিস্থিতিতে রাজনীতিবিদদের বক্তব্যের গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। যে ধরনের শব্দচয়ন করে সাংসদ মহুয়া মৈত্র মন্তব্যটি করেন, তা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্রে বিপদ সংকেত। অথচ রাজনীতির আসল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত দেশের উন্নয়ন, জনকল্যাণ এবং শান্তিপূর্ণ মতপ্রকাশের পরিবেশ সৃষ্টি। পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ, কিন্তু যদি এ ধরনের বিদ্বেষমূলক মন্তব্য, রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা এবং হিংসা-সন্ত্রাস অব্যাহত থাকে, তাহলে রাজ্যের সেই ঐতিহ্য তাতে আড়াল হয়ে যাবে। মহুয়া মৈত্র যা বলেছেন, সেটি নিছকই এক ধরনের নিয়ন্ত্রণহীন ও দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাষণ। তার মনে যা এসেছে, মুখে তিনি তাই বলে ফেলেছেন। কিন্তু কথা বেরিয়ে যাওয়ার পর যখন আইন ও জনরোষের চাপ বুঝেছেন, তখনই সেটিকে 'প্রবাদ' বলে ঢাকার চেষ্টা করেছেন। জনগণ কিন্তু বিষয়টি খুব ভালো করেই বুঝেছে। এর ওপর নিজের দায় ঝেড়ে ফেলতে তিনি আবার ট্যুইট করে লিখেছেন— 'ইডিয়মস্ আর নট ফর ইডিয়টস্'। প্রশ্ন হলো, কাদের বা কাকে তিনি 'ইডিয়ট' আখ্যা দিচ্ছেন? পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষকে, নাকি সংসদে বসা তাঁর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের? এই ঔদ্ধত্যই আসলে প্রমাণ করে যে, জনমতের প্রতি তিনি ঠিক কতটা অসম্মান দেখাচ্ছেন।

এখন সবচেয়ে জরুরি হলো, রাজনীতি যেন ভীতি প্রদর্শন, অশালীন শব্দ ও বাক্য প্রয়োগ এবং পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রচারের পথ ছেড়ে রাজনৈতিক সৌজন্য, সংলাপ এবং পারস্পরিক সম্মান- শ্রদ্ধার স্থানে ফিরে আসে। সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা হলো রাজ্যে এমন একটি রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি হোক, যেখানে বিরোধিতা মানেই শত্রুতা নয়, বরং ভিন্নমতের প্রতি সহনশীলতা। কারণ, রাজনৈতিক হিংসা ও সন্ত্রাসের প্রবাহ কখনোই কোনো সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। শান্ত, সুস্থ ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পরিচালিত রাজনীতিই একমাত্র পথ যা পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে নিরাপত্তা প্রদান করতে পারে। সুস্থ, স্বাভাবিক রাজনীতিই আগামীদিনে এ রাজ্যের হারানো মর্যাদা পুনরুদ্ধারে সহায়ক হবে। □

‘মেক ইন ইন্ডিয়া, ২০২৫’-পরবর্তী মিশন ও ভিশন : ‘দ্য সিলিকন ড্রিম’

ড. অরিন্দম বণিক

একটি বিশ্বমানের ডিজিটাল শক্তিধর দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে বর্তমান ভারত। ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’, ‘ডিজিটাল ইন্ডিয়া’র মতো কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে নেওয়া একাধিক উদ্যোগের কারণে একটি স্বপ্ন দেখতে শুরু করে ১০ বছর আগের ভারত। একটি উন্নত দেশ হয়ে ওঠার স্বপ্ন এখন আর স্মার্টফোন বা অ্যাপ্লিকেশনস্ বা অ্যাপসেই সীমাবদ্ধ নয়। এখন এটি পৌঁছে গিয়েছে প্রযুক্তির হৃদয়ে, অর্থাৎ সেমিকন্ডাক্টর চিপ উৎপাদনে।

বেঙ্গালুরুর তরুণী প্রকৌশলী (ইঞ্জিনিয়ার) অনন্যা দাঁড়িয়ে ছিল ভারত সিলিকন ফাউন্ড্রির ঝকঝকে প্রাঙ্গণে, যা দেশের প্রথম সম্পূর্ণ দেশীয় সেমিকন্ডাক্টর (বা অর্ধ-পরিবাহী সামগ্রী) উৎপাদন কেন্দ্র। তার মনে পড়ে গেল মাত্র এক দশক আগের কথা। তখন ভারত প্রায় পুরোপুরি আমদানি-নির্ভর ছিল সবরকম চিপের ক্ষেত্রে। প্রতিটি ফোন, কম্পিউটার, স্যাটেলাইট, এমনকী বৈদ্যুতিক গাড়িও চলত বিদেশি প্রসেসরের ওপর নির্ভর করে। সাপ্লাই চেইন বা সরবরাহ ব্যবস্থার সংকট দেশকে শেখালো এক কঠিন পাঠ— ‘চিপ উৎপাদন’ ছাড়া ভবিষ্যৎ নেই।

পরিস্থিতি পরিবর্তনের লক্ষ্যে ভারত শুরু করল— ‘চিপ ফর ইন্ডিয়া, চিপ ফর ওয়ার্ল্ড’ মিশন। সরকারি উদ্যোগ, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন স্টার্টআপের সহযোগিতায় তৈরি হলো নতুন ডিজিটাল ইকোসিস্টেম। চেন্নাই, পুনে ও হায়দরাবাদের গবেষণা কেন্দ্র বা ইনফরমেশন-টেকনোলজি (আইটি) রিসার্চ পার্কগুলিতে শুরু হলো ন্যানোমিটার-স্কেল ডিজাইনের কাজ। গুজরাট ও ওড়িশায় গড়ে উঠল পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তিচালিত ফ্যাব্রিকেশন ফেসিলিটি। ভারতের ইতিহাসে প্রথমবার ভারতীয় প্রকৌশলীরা শুধু সফট্ওয়্যার তৈরি করছিল না, তারা সেই হার্ডওয়্যারের নকশা বা ডিজাইন তৈরি করছিল, যা নির্ধারণ করবে দেশের ভবিষ্যৎ।

আইটি ইঞ্জিনিয়ার বা তথ্য-প্রযুক্তি প্রকৌশলী অনন্যার টিম তৈরি করল ৫ ন্যানোমিটার চিপ, যা একটি যুগান্তকারী উদ্ভাবন। এই চিপ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এ.আই.) ও কোয়ান্টাম কম্পিউটিং-এর জন্য অপ্টিমাইজড্। প্রচলিত ডিজাইনের চিপের তুলনায় এটি অনেক কম শক্তি ব্যয় করে। এই কারণে ভারতের গ্রিন টেকনোলজি ইনিশিয়েটিভ বা পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি অভিযাত্রার ক্ষেত্রে চিপটি একেবারে মানানসই। এই চিপের নাম দেওয়া হলো ‘শক্তি’।

এই চিপটি ভারতের ক্ষেত্রে কেবল প্রযুক্তিগত অগ্রগতিই নয়, দেশের আত্মনির্ভরতার প্রতীক। চিপটির আত্মপ্রকাশের দিন সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অনন্যার কণ্ঠে ধ্বনিত হলো— ‘ভারত আর কেবল বিশ্বের ব্যাক অফিস নয়। শক্তি-র মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করেছি যে, উদ্ভাবন আমাদের আত্মায় যেমন রয়েছে, তেমনই তা রয়েছে আমাদের সিলিকন শিল্পেও। ডিজিটাল ভারতের ভবিষ্যৎ কেবল প্রযুক্তি ব্যবহার নয়, বরং প্রযুক্তি সৃষ্টি।’ তুমুল করতালির মাঝেই অনন্যা বুঝতে পারল যে সেমিকন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে এক আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্ন আর কেবল কল্পনা নয়, এটি এখন বাস্তব।

গ্লোবাল সেমিকন্ডাক্টর হাব (ভিশন হাইলাইটস্) : গত বছর গ্রেটার নয়ডায় আয়োজিত হয় ‘সেমিকন ইন্ডিয়া, ২০২৪’। এই সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেন যে, আন্তর্জাতিক সেমিকন্ডাক্টর শিল্পে প্রধান ভূমিকা গ্রহণে ভারত প্রস্তুত।

আর্থিক ও নীতিগত সহযোগিতা : সেমিকন ইন্ডিয়া প্রোগ্রামের আওতায় সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনে ৫০ শতাংশ আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। **কর্মী নিয়োগ ও গবেষণা ইকোসিস্টেম নির্মাণ :** বর্তমান বিশ্বের ২০ শতাংশ সেমিকন্ডাক্টর ডিজাইন ট্যালেন্ট বা অর্ধ-পরিবাহী চিপ ডিজাইন ও উৎপাদনে সক্ষম প্রতিভাবান গবেষক জন্মসূত্রে ভারতীয়। ভারতের লক্ষ্য আগামী দশকে ৮৫,০০০ দক্ষ প্রকৌশলী ও গবেষক তৈরি করা। পাশাপাশি, দেশজুড়ে উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ এবং এই সংক্রান্ত গবেষণায় অগ্রগতির লক্ষ্যে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ‘দ্য অনুসন্ধান ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন’ বা এএনআরএফ-এর মাধ্যমে ১ লক্ষ কোটি টাকার অনুদানও দেওয়া হয়েছে। **ইলেক্ট্রনিক্স শিল্পের প্রসার :** প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য হলো ১৫০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ভারতীয় ইলেক্ট্রনিক্স শিল্পকে বাড়িয়ে ৫০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছানো এবং দেশজুড়ে প্রায় ৬০ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

প্রকৌশলগত আত্মনির্ভরতা : প্রধানমন্ত্রী মোদীজী বলেছেন যে, সেমিকন্ডাক্টর ক্ষেত্রে ভারত এখন চলছে ‘মিশন মোড’-এ। এই বছর, অর্থাৎ ২০২৫-এর শেষ নাগাদ বাজারে চলে আসবে ভারতে তৈরি প্রথম দেশীয় চিপ। ইতিমধ্যেই ভারতে ৬টি সেমিকন্ডাক্টর ইউনিটের কাজ চলছে, যার মধ্যে ৪টি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত।

আঞ্চলিক উৎপাদন কেন্দ্র : গুজরাট রূপান্তরিত হতে চলেছে সেমিকন্ডাক্টর হাবে। একইসঙ্গে নয়ডায় এইচসিএল-ফক্সকন কেন্দ্রটিও ভারত সরকার দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে, যেখানে প্রতি মাসে কয়েক কোটি ডিসপ্লে-ড্রাইভার চিপ উৎপাদন হবে। **প্রকৌশলগত স্তম্ভসমূহ :** মোদীজীর লক্ষ্য— (১) সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনে মিশন মোড। সেমিকন্ডাক্টর চিপ উৎপাদনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ৫০ শতাংশ আর্থিক সহায়তা দান। গবেষণা প্রকল্প পরিচালনায় ১ লক্ষ কোটি টাকার তহবিল এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৮৫,০০০ দক্ষ কর্মী তৈরি। (২) ভারত জুড়ে শিল্পোন্নয়ন— দেশীয় ইলেক্ট্রনিক্স শিল্পের সম্প্রসারণ। ৫০০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের দেশীয় ইলেক্ট্রনিক্স শিল্পক্ষেত্র-সহ দেশে ৬০ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি। (৩) ২০২৫ সালের মধ্যে প্রথম ভারতীয় সেমিকন্ডাক্টর চিপ তৈরি এবং দেশীয় সাপ্লাই চেইন গঠনের মাধ্যমে সেমিকন্ডাক্টর ক্ষেত্রে ভারতের স্বনির্ভরতা অর্জন। (৪) গুজরাট ও নয়ডায় আঞ্চলিক উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন। (৫) দৃঢ় সাপ্লাই চেইন এবং ‘সিলিকন ডিপ্লোমেসি’র মাধ্যমে সেমিকন্ডাক্টর ক্ষেত্রে ভারতের আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা। এভাবেই ‘মেক ইন ইন্ডিয়া, ২০২৫’ পরবর্তী মিশন ও ভিশন— প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে ভারতের যাত্রাকে ত্বরান্বিত করতে চলেছে। এই পর্বে শুধুমাত্র সেমিকন্ডাক্টর চিপ ব্যবহারকারী নয়; চিপ-সংক্রান্ত প্রযুক্তির সৃষ্টিকর্তা এবং চিপ উৎপাদনকারীর ভূমিকায় আবির্ভূত হতে চলেছে ভারত। আগামীদিনে এই ক্ষেত্রে বিশ্বকে নেতৃত্বদানে অঙ্গীকারবদ্ধ নতুন ভারত। □

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪৩২

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

থাকছে

দেবীমাহাত্ম্য, উপন্যাস,
জীবনী, পুরাণ কথা,
বড়ো গল্প, ছোট গল্প
প্রবন্ধ

আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা